প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

প্রকাশক
হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
নব চলন্তিকা
৭, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
দি অন্নদা প্রিন্টার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রয়াল হাফটোন
সরকার বাই লেন
কলকাকা-৭০০ ০০৭

বিজলি সরকার
মালবিকা চৌধুরী
আয়ুষ্মতীষু

আপন কথা

এই বইখানি গড়া হল বিভিন্ন সময়ে লেখা দশটি প্রবন্ধ নিয়ে, যার আটটি বই-সমালোচনা। পত্রপত্রিকায় নিরন্তর এরকম সমালোচনা ছাপা হয় এবং অচিরে হারিয়ে যায়। সমালোচনা-নিবন্ধ সংকলন করার রেওয়াজ বড়ো একটা নেই বাংলা প্রকাশনায়। নব চলন্তিকা প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী শ্রী হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত সমালোচনা-নিবন্ধ নিয়ে তৈরি এই সংকলনটি প্রকাশ করতে যে উৎসাহ বোধ করলেন — এতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর অন্য ধরনের রুচি এবং দায়বোধ অনুভব করেছি।

নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রে আমার সহকর্মী শ্রীমতী বিজলি সরকার পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত লেখাগুলি পরম মমত্বে রক্ষা করে এসেছেন। না হলে কোথায় হারিয়ে যেত। সেই সঞ্চয়ের ঝুলি থেকে বইয়ের জন্য লেখা বাছাই, প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রেসের কাজের যাবতীয় ঝকমারি একা সামলে বিজলি বইখানি দাঁড় করালেন। এমন স্নেহ-করুণায় মন নত হয়ে আসে। প্রুফ দেখায় সাহায্য করার জন্য শ্রীমান দ্বৈপায়ন চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ করেছি।

বিষয়-সূচি

প্রয়োজনীয় সংশোধন

পৃ. ৩৭ শেষ লাইন 'মজিরউদ্দীন''

পৃ. ৪৪ লাইনে ''প্রমা''

রবীন্দ্রনাথ

রাজনৈতিক প্রতিকৃতি নির্মাণের সংকট

পনেরো থেকে আশি পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের জীবনের পঁয়ষট্টি বছরব্যাপী ব্যক্তিত্বের বিকাশকে যদি তাঁর স্বদেশ ও বিশ্বের পরিবর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে নিতে হয়, তাহলে দরকার, তাঁর কালানুক্রমিক রচনাধারা ও আনুষঙ্গিক তথ্যের উপর দখল। তার পরেই গাঁথুনির প্রশ্ন। গাঁথুনির শৃংখলা অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির সংগতি এবং যুক্তি-কাঠামোর সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রয়োজন হয় একটা বড়োমাপের পরিকল্পনা।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দারের প্রায় চারশ পৃষ্ঠার বই 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' হাতে নিয়ে মনে হল, সত্যিই তাঁর আয়োজনটি বৃহৎ।

ভেতরে যাবার আগে শুধু পাতা উলটে গেলেও লেখকের পরিশ্রমের পরিচয়ে বইখানি সম্পর্কে সম্ভ্রম জাগে। কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কারের দাবি তিনি করেন নি, কিন্তু রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ আয়তন বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনুপুর্ব দেখেছেন এবং ব্যবহার করেছেন। তথ্য পাঁজা করে তোলা শ্রীযুক্ত পোদ্দারের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন; একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বের করে আনা। এইজন্যেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটি তথ্য সমাবেশের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গেও বিশেষ করে বলার কথা, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি নিজের প্রত্যয় এবং তত্ত্বগত অবস্থানটি ধরিয়ে দিয়েছেন এবং বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার তার উল্লেখ করেছেন। শুরুতেই বলেছেন, "জমিদাররূপে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক-রাজনৈতিক কাঠামো রবীন্দ্রনাথের অবস্থান নির্দিষ্ট; অন্য দিকে, কবি রূপে তাঁর অস্তিত্ব কোনো সীমা দ্বারা চিহ্নিত নয়, সেখানে দুঃখজর্জর ভারতবর্ষের স্বপ্নঅধ্যাসের সঙ্গে অন্বিত থাকা তাঁর ঐকান্তিক আকৃতি। তাঁর অবস্থান, জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তাঁর চিন্তামননকে প্রভাবিত, সম্ভবত নিয়ন্ত্রিতও করেছে; পক্ষান্তরে, ঐ নিয়ন্ত্রণের সীমা ও শাসন লংঘন করাতেই তাঁর কবি-সত্তার স্ফূর্তি। এই দ্বৈত সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক, বৈপরীত্য, বিক্ষোভ ও ঈপ্সিত সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে। কাব্য-প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাসে এর প্রতিফলন অনিবার্য ও প্রত্যাশিত।" ('নিবেদন')। এবং রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাজকর্ম, অজস্র প্রাসঙ্গিক লেখা পর্যালোচনা করে শ্রীযুক্ত পোদ্দার এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, "সৃজনশীল মানসিক অভিব্যক্তির সমস্ত প্রবাহের মধ্য দিয়েই" নিজেকে উপলব্ধি করার চেষ্টায় "খামার সংগঠন" থেকে "দার্শনিক

ও অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার মীমাংসা" পর্যন্ত তিনি কর্ম ও মননের পরিধি বিস্তারে "অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার" পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু "ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যেই তাঁর চিন্তা-মনন-কার্যকে সীমিত রাখতে হয়েছে ; তাঁর চিন্তা-কর্মে যে ঐ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রতিনিয়ত কাজ করছে, জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

" বিশেষ ঐতিহাসিক কালের যেসব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কালাশ্রিত মানুষের চিন্তা-মনন-কর্মকে বিশিষ্টতা দান করে এবং সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণও করে, যার ফলে কোন আদর্শ সার্থক কোনটা বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববিচারে তা গ্রাহ্য করেন নি অথবা সে প্রেক্ষিত গ্রহণ করেন নি।" (পৃ. ৩৮৫-৮৬)। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ সমস্যা-বিশেষের সাক্ষাৎ বাস্তব জমি ছেড়ে কেবলই উধাও হয়ে যান "বিমূর্ত তত্ত্বে" নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সমস্যার স্বরূপের মধ্যে যুক্তিযুক্ত যোগ খোঁজা তাঁর মনের ধর্ম নয়। শ্রীযুক্ত পোদ্দারের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত, "রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের দুটি অত্যন্ত প্রবল প্রতিবন্ধকতা যুগপৎ ক্রিয়াশীল ছিল।" ১. "বিমূর্ত তত্ত্বের আশ্রয়, যা দেশকালের অতীত এবং যার আদি উৎস পরম ব্রহ্মে কল্পিত স্থিতি"। ২. "ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে জমিদাররূপে তাঁর অবস্থান।" (পৃ. ৩৭৮)। শুধু এই অবস্থান নয়, এ অবস্থান "গতিশীল রাখা" বা এর জের টেনে চলায় তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। (পৃ. ৩৯২)। কর্মজীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাবনা চিন্তা রূপায়ণের যেসব পরীক্ষা করেছিলেন, লেখকের মতে তা যে সফল হয়নি, তার কারণ, "বিমূর্ত ধ্যানধারণা প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্পর্ক রূপান্তরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।" (পৃ. ৩৯০)। অন্য দিকে স্রষ্টা-শিল্পী হিশেবে রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশও প্রতিহত হয়েছে। "জমিদার হিশেবে তাঁর সামাজিক অবস্থানের বাধ্যবাধকতা, প্রচলিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীলতা এবং তজ্জনিত উপায়হীন অসহায়তা অন্য রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ তাঁর কবি-সত্তাকে প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট করছিল ; সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন সংবেদনশীল সত্তা যা ভারতবর্ষের জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁর আত্মিক অন্বয়ের সম্পর্ক স্থাপন সংরক্ষণ ও ঐশ্বর্যশীল করার আকৃতিতে উদ্বেল ছিল। এবংবিধ পরিবেশে অবস্থানের পরস্পরবিরোধী স্বার্থচেতনা ও আদর্শগত বৈপরীত্যের আকর্ষণ-বিকর্ষণে মানসদ্বন্দ্ব অপরিহার্য। এই দুই সংঘাতমুখর শক্তি শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে অবরোধ ও আচ্ছন্ন করে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কখনও কখনও দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি দেখা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, এই সংঘাত ও বৈপরীত্যের অস্তিত্ব ছিল।" (পৃ. ৩৯৪)।

শ্রীযুক্ত পোদ্দারের নিরিখ স্পষ্ট হল বোধ হয়। তাঁর মনন-পদ্ধতিতে কোনো স্ববিরোধ নেই। আগাগোড়া একই parameter, জমিদার-সত্তা কবি-সত্তার

ডায়ালেক্‌টিক প্রয়োগ করে গেছেন। বইটি পড়তে পড়তে একটি লেখ বা গ্রাফ মনে জেগে ওঠে। দুর্মর জমিদার-সত্তার পিছুটান, আর কবি-সত্তার উত্তরণ-সামর্থ্যের নিরন্তর টানাপোড়েনে লেখটি দাঁড়ায় আঁকাবাঁকা। ঊর্ধ্ব গতি মাঝেমাঝেই নেমে যায় উলটো টানে। এই জায়গাগুলিতে লেখক ক্ষোভে অধীর হয়ে ওঠেন। কারণ, শ্রেণীগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতায় পরাভূত হচ্ছেন সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি, "রুদ্রকে, ঝড়কে, অগ্নিকে আহ্বান করছেন, জীর্ণ আবর্জনার স্তূপ ভেদ করে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা আকণ্ঠ পান করতে চাইছেন ·· যিনি সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক।"

দীর্ঘ আলোচনায় লেখক রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যে লেখটি ফুটিয়ে তোলেন তাতে রেখা মারাত্মক রকম নিচুতে নেমে যায় বিশেষ কয়েকটি জায়গায়। যেমন—১. ১৮৯০ সালে 'মন্ত্রী অভিষেক' নামে "অবিশ্বাস্য রকম চাটুবাদী নিবন্ধ" রচনা। ২. স্বদেশি আন্দোলন থেকে কবি সরে দাঁড়ালেন, ১৯০৬-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত একেবারে নীরব রইলেন, তারপর যখন মুখ খুললেন দেখা গেল, "নিছক বাগ্মিতায় অভ্যস্ত নেতৃবৃন্দের মনোভঙ্গির সমালোচনায় তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নির্মম ও বলিষ্ঠ; এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ অপ্রত্যাশিত রকমের প্রচণ্ড; হিংস্র। ···তিনি স্বয়ং এক কল্পনাতীত রাজনৈতিক বন্দরের অভিমুখে সমুদ্রাভিসারে উদ্যোগী।" অর্থাৎ এই সময়টাতে বাংলার বিপ্লবীদের তিনি 'হিংস্র' রকমে আক্রমণ করেন এবং য়ুরোপের প্রশস্তিতে মুখর হয়ে ওঠেন। শোভনতার বাঞ্ছিত সীমাও মানলেন না। ৩. ১৯২৬-এ বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনির খপ্পরে পড়ার ঘটনা। ৪. ১৯৩৪-এ এণ্ডারসনকে হত্যা করার চেষ্টায় বিক্ষুব্ধ হয়ে লজ্জা ও অনুতাপ জানিয়ে তাঁকে তারবার্তা পাঠানো এবং 'চার অধ্যায়' রচনা।

এছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক নানা প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার অবাঞ্ছিত দিকগুলির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। অনেকটা জায়গা নিয়েছেন অসহযোগ, বিদেশি পণ্যবর্জন আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার বিচার-বিশ্লেষণে।

এইসব বিচ্যুতি প্রসঙ্গে লেখকের বিশ্লেষণ এবং মন্তব্যের তীব্রতায় প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ক্ষোভের কারণ এই যে দুস্থ স্বদেশের বন্ধন মোচনের কোনো কোনো উদ্যোগে কবি কিছুতেই একাত্ম হতে পারছেন না। অথচ অবিচল আন্তরিকতায় তিনি মুক্তির বাণী শোনাবেন, তাঁর প্রতিটি উচ্চারণ হবে দেশপ্রাণতার উদ্দীপনায় তেজোময়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বে তাঁর অবস্থান অবশ্যই হবে জনগণের পক্ষে— রবীন্দ্রনাথেরই রচনা থেকে গান থেকে এই প্রত্যাশা জেগে ওঠে। যিনি দেশকে জাগিয়ে তুলেছেন মর্যাদাবোধে,

তিনি কেন সরে দাঁড়াবেন, বা পরিস্থিতি বিশেষে প্রতিপক্ষের প্রশস্তি করবেন, বা সংগ্রামী বীরত্বকে পরিহাস করবেন ? প্রত্যাশা মেলে না যেখানে, লেখক সেখানে তাই ক্ষোভে দীর্ণ হন এবং যেন একটু বেশি রকম অধীরতা প্রকাশ পায় তাঁর ভাষায়। ফলে বিশ্লেষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিচারের বস্তুগত নজিরগুলি সবটা একসঙ্গে চোখে পড়েনা তাঁর।

যেমন ধরা যাক 'মন্ত্রি অভিষেক' নিবন্ধটির কথা। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত রচনাবলিতে এটি স্থান পায়নি, আছে অচলিত-সংগ্রহে। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে কংগ্রেস নীতি বিশদ করে বলাই লেখাটির উদ্দেশ্য ছিল। বাবু-ভদ্রজনের রাজনীতি তখন বিলেতের প্রভুদের ঔদার্যের মুখাপেক্ষী। রচনাটি সেই সুরে বাঁধা। ৫০ বছর পরে এ রচনা সম্পর্কে কবি নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, সে ছিল পায়ের শিকল আরও ইঞ্চি কয়েক লম্বা করার জন্য চেঁচামেচি। প্রভুদের মাথা তাতেই গরম হয়ে উঠত এবং "আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়।" এর পরের বাক্যটি পড়লেই অনুভব করা যায় "গরম ভাষা" কথাটাও শ্লেষ। বলছেন, " মনে রাখতে হবে, এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।" মূল লেখায় ইংরেজদের সম্পর্কে কিছু বক্রোক্তি আছে। যেমন, "ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা গোপন করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে।" "গরম ভাষার" দৌড় এই পর্যন্ত এবং সেটা মনে করে কবি কৌতুকই বোধ করেছেন। অরবিন্দবাবু শেষ বাক্যটি তোলেন নি এবং "গরম ভাষা" উক্তিটি সাফাই ধরে নিয়ে "মর্মপীড়ায় পীড়িত" হয়েছেন। যে ফরমায়েশি লেখা কবি নিজেই খারিজ করে দিয়ে গেছেন তা নিয়ে এমন বিক্ষোভ এবং "শ্রেণী, ঐতিহ্য, পারিবারিক আশা আকাঙ্ক্ষা, শ্রেণীগত স্বার্থবোধ, মূল্যবোধ ইত্যাদির বন্ধন ছিন্ন করা কত কঠিন, কী দুঃসাধ্য" -এমন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো বড়ো কাঁচা লাগে।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার বিবর্তনে স্বদেশি আন্দোলন একটি জটিল পর্ব। ভারতীয় রাজনীতিতে পরে যেসব ধারার বিকাশ দেখা গেছে কোনো-না-কোনভাবে তার বীজ ওই সময়েই পোষিত হয়েছিল। শক্তির এবং দুর্বলতার সমস্ত বীজ। রবীন্দ্রনাথ যে এই আন্দোলনে পূর্ণত লিপ্ত হলেন, তাঁর পক্ষে সেটা অনিবার্য ছিল। তাঁর সৃষ্টিময় প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল দেশের মাটির পুষ্টিতে। পারিবারিক কর্তব্যের দায় নিয়ে গ্রাম বাংলায় বসবাস গভীর ব্যাপক তাৎপর্যে আত্মপরিচয় উপলব্ধির সুযোগ এনে দিয়েছিল তাঁর জীবনে। দৈনন্দিন জীবনে দুস্থ গণসমাজের বাস্তব সমস্যার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় তিনি জন্মের পরিবেশের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে গেলেন। বাস্তব স্বদেশে সংলগ্ন হতে পারলেন। বনস্পতির

বিশাল বিস্তার এল তাঁর সৃষ্টিতে। বাংলার বাণী ও সুরে যে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে গেল তাঁর প্রতিভার বিকিরণে, বাস্তব স্বদেশের সংলগ্নতা ভিন্ন সে ঘটনা সম্ভব হতনা। সত্তার শিকড় দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরার আবেগ তাঁর রচনার মধ্যে, তাঁর গানে যে শুদ্ধ শিল্পরূপ পেল — তারই মূল্যে এই প্রাদেশিক সংস্কৃতি বিশ্বের আধুনিক মান স্পর্শ করতে পারল। স্বদেশের সঙ্গে তাঁর অস্তিত্বের এই স্নায়ু-শিরার যোগের দিক থেকে বোঝা যায় — বঙ্গবিভাগের আঘাত যখন এল, সে আঘাত কোথায় বেজেছিল তাঁর অস্তিত্বে। মর্ম ছিন্ন করে দেবে এ আঘাত, এমন আশঙ্কায় তিনি সবার সামনে গিয়ে জায়গা নিয়েছিলেন, প্রতিরোধে উদ্যত হয়ে উঠেছিলেন। এই অনুপ্রেরণার কথা স্মরণ করে অনেক পরে লিখেছিলেন, "আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্পের সম্পূর্ণ ধ্যানমূর্তি জেগে উঠেছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে vision। তখন বয়স ছিল অল্প, মনের দৃষ্টিশক্তিতে একটুও চালশে পড়েনি। জীবনের লক্ষ্যকে বড়ো করে, সমগ্র করে, স্পষ্ট করে দেখতে পাবার আনন্দ যে কতখানি তা ঠিকমতো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানিনে। সে আনন্দের পরিমাণ পাবে আমার ত্যাগের পরিমাপে। আমার শিলাইদা, আমার সাহিত্যসাধনা, আমার সংসার— সমস্তকেই বঞ্চিত করে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আমার ঋণের বোঝা ছিল প্রকাণ্ড, কাজের অভিজ্ঞতা ছিল নাস্তি। তার পরে সুদীর্ঘ কাল এই দুস্তর অধ্যবসায়ে একলা পাড়ি দিয়েছিলুম। কাউকে দোষ দিইনি, কারও উপর দায় চাপাই নি, কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি। তারি মাঝখানে সংসারের নানান দুঃখ গেল। কিন্তু সেই সময়টাতেই মনের ভিতর মহলে যেন সব আলোই জ্বলে উঠেছিল। সেটা বুঝতে পারবে যদি ভেবে দেখো তখনকার বঙ্গদর্শনে কী লিখেছি, তখনকার পার্টিশন আন্দোলনে কী দোলা লাগিয়েছি— মনের মধ্যে ভারতবর্ষের একটা নিত্যরূপ দেখা দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে মানুষের বিশ্বরূপের বিরোধ নেই, আমার এই নানামুখী চেষ্টার মাঝখানে একটা তপস্যা ছিল — একেবারে ছিলুম সন্ন্যাসী, সত্যের অন্বেষণে এবং সত্যকে রূপ দেবার একান্ত সাধনায়।" ('পথে ও পথের প্রান্তে', ১৮ সংখ্যক চিঠি)।

আরোপিত সব বাধা ভেঙে এই উত্তরণে কবির আত্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়েছিল। অনুভব করেছিলেন, "জীবনের কেন্দ্র থেকে একটি উজ্জ্বল ধ্যান, নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের মতো, অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।" "ভিতর মহলের সব আলো জ্বলে ওঠার" পূর্ণতা বোধ এল দুস্থ স্বদেশের, স্বজাতির সর্বাত্মক আত্মোপলব্ধির উদ্যোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের অভিজ্ঞতায়। অরবিন্দবাবুর বিবেচনায় অবশ্য স্রষ্টা ব্যক্তিত্বের এই ভেতরের গরজ এবং উত্তরণের আকুলতা ব্যাপারটি গৌণ। তিনি বলে রাখেন, " সর্বোপরি জমিদার শ্রেণীর একজন অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যে খ্যাতি ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত

ছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে এই আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করে।" (পৃ. ১২৯)। কারণ, আন্দোলন যখন তুঙ্গে সেই সময়ে নেতৃত্বের একেবারে প্রথম সারিতে থেকেও কবি যে অকস্মাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় লেখক জমিদার-সত্তার পিছুটানের তত্ত্ব প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি রাখতে চান। মুশকিল হল, জমিদার-সংঘ দেশ বিভাগের ফলে যে বিরাট আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের তেমন প্রকট স্বার্থবুদ্ধির কোনো প্রমাণ লেখক দেননি। প্রসঙ্গটি আলোচনায় লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ['বঙ্গবিভাগ'] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক্রমে লোপ পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।" (পৃ. ১২২)। কিন্তু ঐ 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে দেখছি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "...যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরিবাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারেনা, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউন-হল হইতে উদবোধিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুনঃ বিলোপের আর অন্ত থাকিবে না।" রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে এখানে? নিজের যুক্তি কাঠামোর মধ্যে খাপ খাওয়ানোর জন্য ছিন্ন উদ্ধৃতি দেওয়া বা মূলের তাৎপর্য বিকৃত করা বৈজ্ঞানিক আলোচনা পদ্ধতির নজির বলে মানা যায় কী করে? এ আলোচনারই জের হিশেবে আসে "গোত্রান্তরিত" রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোয় এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিবিষ্ট হবার উপদেশের সমালোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি। শুদ্ধ এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে তোলা উদ্ধৃতি থেকেই পাঠক বুঝবেন, রামেন্দ্রসুন্দরের অনুযোগের কোনো ভিত্তি ছিলনা। স্বদেশি আন্দোলনের গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গঠনমূলক কাজের কথা বলে এসেছেন। কথাটা হঠাৎ আসেনি। এবং এটা কোনো পলায়নী মনোবৃত্তি যে নয়, নিজের তত্ত্ব কাজে প্রয়োগে তাঁর জীবনব্যাপী প্রয়াসে তা প্রমাণিত। লেখক যেভাবে অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচেরি প্রয়াণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "গোত্রান্তর" একাকার করে দেখেন (পৃ. ১৩৮) তাতে সত্যি সত্যি বিমূঢ় হতে হয়।

অরবিন্দবাবুর মতে "গোত্রান্তরিত", "গুণগতভাবে স্বতন্ত্র" (পৃ. ১৪৬) রবীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ ও হিংস্র মনোভাব প্রকাশ করলেন, তাঁর "কণ্ঠে যেন প্রতিহিংসার উন্মাদনা" (পৃ. ১৩৮)

দেখা দিল। শুধু তাই নয়, তিনি অভিনন্দিত ইংরেজভজা রাজনীতির কোলে আশ্রয় নিলেন। কার বিরুদ্ধে, কিসের বিরুদ্ধে হিংস্র প্রতিহিংসা? কেউ কি তাঁর ব্যক্তিগত কোনো সর্বনাশের আয়োজন করেছিল যে হিংস্র প্রতিহিংসায় মেতে উঠবেন। বিষয়টা তো মতবাদ ঘটিত। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কারণই বা কী, অবকাশই বা কোথায়। এত উদ্বেজিত হওয়াতেই স্বাদেশি আন্দোলনের আলোড়নে জেগে ওঠা সমস্যাগুলির সামনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার রূপান্তর অরবিন্দবাবু নিজের লেখায় স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। এ আন্দোলনে চরমপন্থী, নরমপন্থী ঝোঁক পূর্বাপর ছিল। সাময়িক একটা মোর্চা তৈরি হয়ে উঠলেও সে মোর্চা স্থায়ী হয়নি। সাময়িক সেই মোর্চার পর্বে সব মত-পন্থীরা রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন মনে করেছিলেন। প্রথম থেকে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের কথা রবীন্দ্রনাথই বারবার বলেছেন। তাঁর প্রোগ্রামে প্রয়োজনে পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। মূল কথাটা অবশ্যই ছিল গণসমাজের সঙ্গে একাত্মতা এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণের ভেতর দিয়ে সামাজিক ফাটলগুলি জুড়ে এনে সর্বাত্মক সংহতি অর্জন। কেউ কেউ তাঁর ভাবনায় রোম্যান্টিক কল্পনা দেখেছিলেন তখন, আজ অরবিন্দবাবু "বিমূর্ত ভাবনা" বলছেন। অথচ দেশের মূল সংকট কোথায় তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই সেদিন যথাযথভাবে ধরা দিয়েছিল। দেশের নামে ডাক দিলেই দেশের মানুষ সাড়া দেবে— এই প্রত্যাশার অবাস্তবতা তাঁর বিশ্লেষণেই তীক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের সংহতি চৌচির হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, এই ট্রাজিডির কারণ সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়েছিল ইংরেজের উশকানিই একমাত্র নয়, ফাটল রয়ে গেছে আমাদেরই ঘরের মধ্যে। মহাজাতি গঠনের আহ্বানটা এই বাস্তব বিশ্লেষণেরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি, কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব নয়। নয় যে, তা তো তিন টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের বাসিন্দা আমরা আজও মর্মে মর্মে বুঝছি। ইংরেজ নেই কিন্তু বছরে বারোমাসই কোথাও-না-কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আছেই। ফাটলগুলো আজও বোজানো যায়নি। বরং বেড়ে চলেছে।

অবশ্যই এটা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসমূলক রাজনীতি সমর্থন করেন নি। একটিই কারণ তার। গণসমাজের সামগ্রিক জাগরণের লক্ষ্যে পৌঁছবার দীর্ঘ শ্রমসাধ্য আয়াস এড়ানোর ঝোঁক থেকেই সন্ত্রাসের পথ বেছে নেওয়া হয়— এই ছিল তাঁর বিশ্লেষণ। বিপ্লবী দলগুলির নেতৃত্ব করেছেন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণেরা। গুপ্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির অসীম বীর্য, অশেষ আত্মত্যাগ দেশের জনমনে অবশ্যই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সে শ্রদ্ধেয় তরুণদের স্মৃতি মহার্ঘ। ইংরেজ রাজত্বের অবসান তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমগ্র বিপ্লবী তৎপরতার ইতিহাস থেকে এই মূল কথাটা বেরিয়ে আসে যে, নির্বাচিত এলাকায় বা বিশেষ বিশেষ কর্তাব্যক্তির উপরে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে এরা প্রমাণ করেছিলেন—

পরাক্রান্ত ইংরেজ রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করা যায়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা এঁদের নির্যাতন ভোগে ও আত্মত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আবার এও ঠিক যে বিপ্লবী তৎপরতাগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা রয়ে গেছে। এ তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক জনগণের সংযোগ রচিত হয়নি। কোনো ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানের প্রকল্পের কথা ভাবা হয়নি। দেশের ছেলেদের নির্যাতন ভোগে আত্মোৎসর্গে রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রণাবোধ শ্রদ্ধাবোধের অনেক দৃষ্টান্ত অরবিন্দবাবু দেখিয়েছেন। মানুষকে সঙ্গে নিতে হবে, মানুষের মনে অধিকারবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মনির্ভরতা জাগাতেই হবে সর্বাত্মক মুক্তির জন্য। দীর্ঘ তিতিক্ষাময় এ পথের কোনো বিকল্প নেই, এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ কখনও ছাড়েন নি। নিজের অবস্থানে অবিচল থেকে তবুও তিনি দেশের তরুণদের আত্মত্যাগের মহিমাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন— যার দৃষ্টান্ত এ বইয়েও সংকলিত আছে। প্রশ্ন হল, রবীন্দ্রনাথ "গুণগতভাবে" বদলে যাবার পরেও বিপ্লবীদের জন্য আন্তরিক যন্ত্রণাবোধ, শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করতে থাকলেন? "গুণগত পরিবর্তন" অর্থ কী তাহলে? "ইংরেজ-ভজা" হয়ে গেলেন, আবার ইংরেজ-মারা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহিমায় সাড়া দিতে থাকলেন— এই বা কী করে মেলানো যায়? লেখক যে নিক্তি দিয়ে মাপতে বসেছেন, মাপবার বস্তু যেন সে নিক্তিটি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

'গোরা' উপন্যাসে গোরার চূড়ান্ত উপলব্ধির তাৎপর্য সম্পর্কে অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেছেন, "বিরোধ-বিদ্বেষ জর্জরিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে এ এক অভিনব উপলব্ধি, স্বপ্নঅধ্যাসের রঙে-রেখায় আঁকা এক মহিমাময় অভিজ্ঞতা...। কালের নিরন্তর চ্যালেঞ্জ ও আহ্বানে এটাই রবীন্দ্রনাথের আত্যন্তিক সাড়া। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার জটিলতা যে মানস-সংঘাত সৃষ্টি করেছিল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে সমস্যার কোনো গ্রহণীয় সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না, এই ঐশ্বর্যশীল সাড়া ও স্বপ্নকল্পনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সংঘাতের পীড়ন থেকে মুক্তি অর্জন করেন।...তা মানবিক মূল্যবোধ এবং মানবগোষ্ঠীর অবিভাজ্যতার চেতনা দিয়ে গড়া।" (পৃ. ১৫৩-৫৪)। 'গোরা' উপন্যাস মোটামুটি ঠিক দৃষ্টিতেই পড়েন অরবিন্দবাবু। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এক পাতা পরেই 'সমস্যা' প্রবন্ধ থেকে একটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথকে লেখক ইংরেজের স্তাবক মার্কা দিয়ে দেন।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই পড়ছি, "বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবহৃদয়ে ক্রমেই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে, তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত

করে— কারণ ; তখন সে অশক্তকে আঘাত করেনা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বজ্রমুষ্টি চালনা করে।...যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বলো যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা - তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইমসের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদ রচয়িতা এবং পায়োনিয়র-ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ের জোর আছে বটে, তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।"

বোধচৈতন্য একান্ত অসাড় না হলে এই প্রবন্ধ ধরে কী করে মন্তব্য করা যায়, "সাম্রাজ্যবাদী শাসনের...বিস্ময়ে বিমূঢ় করা প্রশস্তি" করছেন রবীন্দ্রনাথ, কিংবা বলা যায় এ হল "আত্মপ্রবঞ্চনাময় বিশ্লেষণ ?" এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, য়ুরোপে মানব সভ্যতার একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। বলেছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের মাধ্যমে সেই নতুন ইতিহাসের বার্তা এসে পৌঁছল এবং সে বার্তার ইতিবাচক দিক ভারতবর্ষ যদি উপেক্ষা করে ভারতীয় ইতিহাসের উত্তরণ সম্ভব হবেনা। ইংরেজের সঙ্গে মিলনের প্রসঙ্গ এসেছে এই সূত্রে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতার সূত্রে নয়। মার্কসও নাকি বলেছিলেন, ইংরেজ ভারতে ইতিহাসের এক অনিচ্ছুক যন্ত্রের ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজ এদেশে, "বর্তমান যুগসত্যের দূত", "তাঁহারা উপলক্ষ"। ("ছোটো ও বড়ো", 'কালান্তর')। অরবিন্দবাবু "ইওরোপ তো সাম্রাজ্যবাদী ইওরোপ" বলে মানবসভ্যতার আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপের ভূমিকা খারিজ করে দেন। য়ুরোপে বুর্জোয়া বিকাশের প্রগতিশীল দিক বা সেই বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, মানবিক অধিকার সম্পর্কে নতুন চেতনা ইংরেজের সংস্পর্শেই যে এদেশে চারিয়েছে এবং ভারতীয় মধ্যযুগের অবসান সূচিত করেছে, কাণ্ডজ্ঞানখণ্ড সমাজদৃষ্টিতে এটা কখনও উপেক্ষিত হতে পারেনা। মার্কসের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যময় উক্তিতে বা রবীন্দ্রনাথের বিশদ আলোচনায় সেই প্রখর ইতিহাসবোধ ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তি। বস্তুনিষ্ঠা এবং বিবেচ্য বিষয়বস্তুর সমস্ত দিক ঘনিষ্ঠভাবে বিচার এবং কোনো পরিস্থিতির অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-বিরোধে নেতিবাচক-ইতিবাচক শক্তির টানাপোড়েন স্পষ্ট হিশেবের মধ্যে ধরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এঁরা এই প্রণালীতেই ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। সে বিশ্লেষণের ফলাফল কোনো সরল ছকের মধ্যে ধরাতে না পারলে তৈরি করা ছকটিরই সীমাবদ্ধতা প্রমাণ হয়।

অনেকেই বলেছেন, অরবিন্দবাবুও বলেন, রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তির তত্ত্ব এবং সামাজিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কার্যক্রম ইউটোপিয়ান। সাম্রাজ্যিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে এ কার্যক্রম সফল হতেই পারেনা। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা সম্পর্কে অরবিন্দবাবু মন্তব্য করেন, "রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প, যা বৃহৎ রাষ্ট্রের সমান্তরালভাবে অস্তিত্বশীল থাকবে, যা প্রত্যক্ষ কর্ম ও উদ্যমের মাধ্যমে দেশের চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ও শক্তি অর্জন করবে ; পরিণামে কোনো এক সময় তা বৃহৎ রাষ্ট্রের উৎসাদন ও তার স্থান অধিকার করবে।" (পৃ. ১০৪)। ঠিক কথা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন অপরিহার্য, এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বায়ত্ত শাসনের তত্ত্ব এবং কর্ম-পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ভারতে ইংরেজ শাসন অপরিহার্য— এই বিশ্বাস ভুল প্রতিপন্ন করে দেওয়া। কোনো নেতা বা সংগঠন রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। নিজের সাধ্যের মধ্যে তিনি এই কর্ম-পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্যোগ করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। লেখক নিজেই সজনীকান্ত দাসের লেখা থেকে খবর দিচ্ছেন, যে-কর্মীরা এই কাজে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই অন্তরীণ হন এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এতে কি প্রমাণ হয়না, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছিল? রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধ প্রতিপন্ন করার ঝোঁকে লেখক প্রশ্ন তোলেন, " তাহলে তিনি কিভাবে এই প্রত্যাশায় অনুপ্রাণিত হলেন যে, স্বদেশী সমাজের হাতে শক্তি ও ক্ষমতা সংহত হলে সাম্রাজ্যবাদ বাধা দান করবে না, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী সমান্তরাল — এবং সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য উৎসাদক— শক্তি হিসাবে স্বদেশী সমাজের বেড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী মেনে নেবে?" (পৃ. ১০৯)। উদ্ভট প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তো তাহলে কোনো কর্মপন্থাই নেওয়া চলেনা, বিপ্লবী পন্থাও নয়। কারণ, স্বদেশি সমাজের মতোই "সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন এর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিত।" নিজের চিন্তার প্রকট অসংগতি সামাল দিতে একই ঝোঁকে লেখক তথ্য প্রমাণ ছাড়াই গত্যন্তর-হীন সিদ্ধান্ত করে বসেন, "ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা নির্মিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আর্থনীতিক কাঠামোর চৌহদ্দির মধ্যেই অস্তিত্বশীল থাকবে বলে স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা ; এর উৎসাদনের সর্ত অথবা প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে নয়।" (পৃ. ১১০)। আহাম্মক সাম্রাজ্যবাদীরা এটা ধরতে পারেনি নিশ্চয়। নয়তো অনর্থক পুলিশ লাগাতে যাবে কেন? পাতায় পাতায় অরবিন্দবাবুর লাফগুলো এমন তেড়াবেঁকা যে তাল রাখাই মুশকিল।

রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনি-চক্রের জালে গিয়ে পড়া এক চরম বিভ্রমের ব্যাপার —এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি পূর্বাপর প্রতারিত হয়েছিলেন। "ফ্যাসিবাদের পক্ষ সমর্থন করা আমার পক্ষে এক ধরনের নৈতিক

আত্মহত্যা"— এই অনুশোচনার পরে এ বিষয়ে আর অভিযোগ করা যায়না বোধ হয়। ('এক্ষণ', শারদীয় ১৩৮৫ সংখ্যায় অবন্তী সান্যালের প্রবন্ধ, পৃ. ৯১)।

আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপন্যাসকে সমাজবাস্তবতার ব্যাপ্ত জমির উপরে দাঁড় করিয়েছিলেন। সরাসরি রাজনীতিকে তিনি উপন্যাসের বিষয়ভূত করেন, কারণ, আধুনিক সমাজে রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং কর্মপন্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। উপন্যাসের মহত্ত্ব ও গৌণতা বিচার করা হয় বিষয়-ভাবনার বিস্তারের দিক থেকে। সে বিচারে 'গোরা'র মহাকাব্যিক বিস্তার 'চার অধ্যায়ে' নেই। 'চার অধ্যায়ে' লেখকের অবলোকনের পরিধি সংকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যে কারণে যা-ই বলুন না কেন, উপন্যাসটির থীম রাজনৈতিক। কিন্তু রাজনীতির যে ধারাটি তিনি বিষয় হিশেবে নিয়েছেন, তারও সমগ্র পরিচয় উন্মোচনের দায়িত্ব পালন করেন নি। গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সংকট ও দুর্বলতার দিকটি একপেশেভাবে এঁকেছেন, ভারতীয় পরিস্থিতির মুখ্য দ্বন্দ্ব— সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্বে এই আন্দোলনের ইতিবাচক ভূমিকাটির গুরুত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেন নি। বিষয়-ভাবনার দিক থেকে উপন্যাসটি তাই খণ্ডিত এবং দুর্বল। রচনাশৈলী অত্যন্ত ক্ষিপ্র। ভাষায় ঝলক যতটা, গভীর বিশ্লেষণের আধার হয়ে ওঠার উপাদান তেমন নেই। অতীনের অভিজ্ঞতার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির নৈতিক ভিত্তির আভাস মাত্র দিয়েছেন। এমন সব ছেলেকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছে অতীন যাদের আত্মত্যাগ শ্রদ্ধায় তার মাথা নুইয়ে দেয়। শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে উপায়হীন দেশবাসীর লড়াইয়ে প্রমাণ করতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মনুষ্যধর্মে, চারিত্রনীতিতে বড়ো— এই বিশ্বাসে অতীন মাথা উঁচু করে দলের কাজে নিজেকে জড়িয়েছিল। লড়াই সে নীতির উপরে দাঁড়াল না শেষ পর্যন্ত। তবুও যে-সঙ্গীরা চরম বিপদের জালে জড়িয়েছে তাদের সে ত্যাগ করতে পারেনা। "মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি" ক্রমে যে পাঁকের দিকে টেনে নিচ্ছে, ন্যাশনালিস্ট আদর্শের এ ভ্রষ্টতায় ক্ষুব্ধ অতীন সেই একই সংকট দেখতে পায় পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্টদের পাশব গর্জনে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এই নৈতিক বক্তব্যের আভাসই আছে, প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন নেই।

অরবিন্দবাবুর উপন্যাসটি সম্পর্কে আপত্তি অবশ্য এদিক থেকে নয়। উপন্যাসটিকে তিনি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ দ্বন্দ্বের নজির মনে করেন। "এক দুর্জ্ঞেয় কারণে" রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাস রচনা করেছিলেন মন্তব্য করলেও সে দুর্জ্ঞেয় কারণটি বিশদভাবেই জ্ঞাত করিয়েছেন। "...তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয়, ইংলণ্ড-ভারতবর্ষ সম্পর্কিত ভাবনা, ভূম্যধিকারী হিসেবে ঔপনিবেশিক কাঠামোর তাঁর অবস্থানের জটিল গ্রন্থি থেকে বিযুক্ত হতে পারেননি। বৈপ্লবিক কর্মপন্থার বিরুদ্ধে উচ্চারিত তাঁর কঠোর সমালোচনার উৎসও সেই

গ্রন্থিতে।" (পৃ. ৩০৫)। অর্থাৎ সেই জমিদার-সত্তার পার্টটিই আবার ফিরে আসে। বিপ্লবপন্থীদের আক্রমণের মুখে সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের বিভীষিকা সৃষ্টির চেষ্টায়, বিপ্লবীদের উপরে অমানুষিক পীড়নের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কালানুক্রমিক বিবরণ অরবিন্দবাবু সংকলন করেছেন। 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লবী উদ্যোগে চারিত্রনীতির দিক থেকে বিচ্যুতির পাশাপাশি এইসব তথ্য থাকায়, "এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে নয় শুধু তার আগেও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, এবং তিনি সাংস্কৃতিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন" (পৃ. ৩২২)— লেখকের এই সিদ্ধান্ত মানা কঠিন। স্পষ্টতই তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'সহযোগবাদী' বা collaborator দাঁড় করিয়েছেন। কী তথ্যের ভিত্তিতে এমন চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন? ১২.৪.৮১ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় (রবিবাসরীয়) প্রকাশিত শিশির করের একটি প্রবন্ধ এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দুটি নথি। এই নথিপত্রের তথ্য এবং শিশির করের প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে ১৯৮২র শারদীয় 'পরিচয়ে' চিন্মোহন সেহানবীশ প্রশ্ন তুলেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, অরবিন্দবাবুর ত্বরিত সিদ্ধান্তের সমর্থন শিশির করের লেখায় নেই। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, 'চার অধ্যায়' লিখে যে-রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন বলা হয়েছে, সেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'চার অধ্যায়' প্রকাশের পরের মাসের গোয়েন্দা বিভাগের একটি রিপোর্ট শ্রীযুক্ত সেহানবীশ তুলে দিয়েছেন। রিপোর্টটিতে মন্তব্য করা হয়েছে, "A very recent source report from Calcutta alleges that he is now more rabidly anti-Government than he was in the past and states that this is apparent in a novel which he has recently published. It is alleged that this novel 'has extolled the revolutionary cult in Bengal.' The Calcutta Special Branch review of this novel is below, together with the opinion of the Public Prosecutor,Calcutta. He has recommended the forfeiture of the book under the Press Emergency Powers Act of 1931. The view he has taken when considered with the reaction of an agent to the book, leaves one with no doubt that its effect in Bengal must be harmful." আরও বলা হয় রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত এমন যে তাঁর মতো লোককে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে আহ্বান করা অবাঞ্ছিত।

সমস্যাটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে অরবিন্দবাবুর সিদ্ধান্ত টলে যায়। তার চেয়েও গুরুত্বর প্রশ্ন, নিছক সরকারি নথির ভিত্তিতে আমরা কতটা

সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি? স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রেস-দপ্তরের নথি অনুযায়ী 'চার অধ্যায়' সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন রুখবার একটি চমৎকার হাতিয়ার (৩২১ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি), আর সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই গোয়েন্দা-দপ্তরের মতে বাংলাদেশে প্রশাসনের পক্ষে উপন্যাসটি সমূহ ক্ষতিকর এবং বাজেয়াপ্ত করা উচিত। একই প্রশাসনিক বিভাগের দুই দপ্তরের মূল্যায়নে এমন বৈপরীত্য দেখা দিল কেন— তার ব্যাখ্যাও গবেষকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইদানীং ইতিহাসচর্চায় ইংরেজ আমলের নথিকে যতটা অকাট্য প্রমাণ মনে করা হচ্ছে— সে বিষয়ে সংশয় জাগে এ থেকে।

অরবিন্দবাবুর তড়িঘড়ি "অপরিহার্য সিদ্ধান্ত" টানার আর-একটা নজির : প্রেস দপ্তরের নথিতে পেলেন 'চার অধ্যায়' অভিনয় করানোর চেষ্টার কথা, আর রবীন্দ্রভবনে পাওয়া গেল 'চার অধ্যায়ে'র নাট্যরূপ। অন্য কোনো প্রমাণের দরকার বোধ করেন না লেখক। ধরে নেন বশংবদ রাজকর্মচারীদের দিয়ে লেখানো নাটকের মতোই সরকার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে 'চার অধ্যায়' নাটক লিখিয়ে নিলেন।

রবীন্দ্রনাথকে সহযোগবাদী প্রমাণের জন্য অরবিন্দবাবু জমিদার-সত্তা ও কবি-সত্তার দ্বন্দ্বের তত্ত্ব খাটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অবস্থানটি বার বারই হিশেবের বাইরে রাখেন এবং নিজেরই বৈপরীত্য প্রকট করে তোলেন। যে 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধের বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সহমর্মিতার উল্লেখ লেখক করেছেন, সেই প্রবন্ধেই রয়েছে, "...আমাদের দেশের লোক, যাঁরা বলেন আমার পদ্যেও অর্থ নাই, গদ্যেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে দুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনওই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া ওঠে।...আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পন্থা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকাশ্য ; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'এক্স্ট্রীমিজ্‌ম্' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি, সেই জন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, 'এক্স্ট্রীমিজ্‌ম্' গবর্নমেন্টের নীতিতেও অপরাধ।" স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে এই একই কথা ভেবে এসেছেন। চারিত্রনীতির দিক থেকে দেশের মানুষ ইংরেজের চেয়ে উঁচুতে যদি উঠতে না পারে, তাহলে মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁর এই ভাবনায় চারিত্রনীতির প্রশ্নটি ত্রিমাত্রিক। ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং স্বরাজ সংক্রান্ত। মুক্তবুদ্ধির বিচারে অভ্যাসের দাসত্ব এবং সর্ববিধ সংকীর্ণতা অতিক্রম

করে ব্যক্তিমানুষ প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বহুযুগ সঞ্চিত স্বার্থচেতনা, অমানবিক আচার ও বিভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠবে ; সমাজের মধ্যে হাজার রকমের যে ফাটল তৈরি করে আসা হয়েছে— বুদ্ধির মুক্তিতে, যুক্তি-বিচারের পথেই সেই বিঘ্ন অতিক্রম করে সংহতি রচিত হতে পারবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিশেবেও তিনি এই চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতেন। গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধের মূল জায়গাটা এইখানে। মুক্ত বিচারবুদ্ধির উপরে গান্ধীজি ষোল আনা ভরসা রাখেন না বলেই চারিত্রনীতির দিক থেকে তাঁর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানান। স্বাদেশিক উদ্যোগে বিপ্লব-পন্থার 'শর্টকাট' সম্পর্কেও তাঁর সংশয় ঘোচেনি। মনে করেছেন, জটপাকানো আমাদের সমাজের দুর্বলতার কারণগুলি উচ্ছেদ করার দীর্ঘ সংগ্রামের পথ এড়িয়ে এবং দেশের মানুষকেই এড়িয়ে গিয়ে এ পথে কোনো বড়ো সিদ্ধি অর্জিত হতে পারেনা। প্রকৃত গণসমর্থনপুষ্ট কোনো বিপ্লবী অভ্যুত্থানে নিশ্চয়ই দুর্গত দেশের জীবনে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া যায়। তেমন আয়োজন সত্যিই যদি গড়ে উঠত, রবীন্দ্রনাথ কি নৈতিক সমর্থন জানাতেন ? রুশ বিপ্লবের সফলতায় তাঁর আন্তরিক অভিনন্দনের নজিরে ভাবা যায়, তেমন ঘটনায় তিনি অকুণ্ঠভাবে সাড়া দিতে পারতেন। যথার্থ আত্মত্যাগের মহত্ত্বকে মানবমুক্তির কোনো প্রয়াসকে জীবনে কখনও তিনি তাচ্ছিল্য করেন নি। বিপ্লবপন্থার অন্তর্গত দুর্বলতা, গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার সংকট সম্পর্কে সমালোচনা সত্ত্বেও তাই বলতে পেরেছেন, "মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই।" ('ছোটো ও বড়ো')।

একই চারিত্রনীতির সম্প্রসারিত প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার সংকট ব্যাখ্যা করেন। বলেন – আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, আরোপিত সমস্ত বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানবমুক্তির প্রেরণা একদা উৎসারিত হয়েছিল য়ুরোপ থেকে। জাতীয় স্বার্থের নামে, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে সেই য়ুরোপ আধুনিক চারিত্রনীতির শ্রেয় নির্লজ্জভাবে দলন করল দেখে ক্ষোভে য়ুরোপের এই বিকারকে অভিসম্পাত দেন, বলেন—"বিনিপাত"। নীতিভ্রষ্ট জাপানকে কঠিন সমালোচনা করেন। "ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতার" বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ আক্রমণের পাশে ভারতীয় বিপ্লবীদের ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে আঁতাতের প্রতি-ক্রিয়াশীতাও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ব্যাপক নৈতিক কাঠামো হিশেবের মধ্যে নিলে তাঁর কোনো কোনো আচরণের আপাত অসংগতির ব্যাখ্যা সহজ হয় এবং অকারণ-চিত্তক্ষোভের কারণ থাকেনা।

যে ডায়ালেকটিক বা দোটানার তত্ত্ব অরবিন্দবাবু তৈরি করেছেন তার এক প্রান্ত হল রবীন্দ্রনাথের দুর্মর জমিদার-সত্তা। গোটা বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন,

জমিদার-সত্তাই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রগতি-বিরোধী আচরণ ও ভাবনার মূলে। জীবনের একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত বরাবরই "দুঃখজর্জর ভারতবর্ষের স্বপ্ন-অধ্যাসের সঙ্গে অন্বিত" থাকার ঐকান্তিক আকুতি বাধা পেয়েছে জমিদার রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধির কাছে। এই তত্ত্ব-ভিত্তির বনেদ কতটা পাকা বুঝবার জন্যে জমিদাররূপে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় জানতে আগ্রহ স্বাভাবিক। বইয়ের মধ্যে খানিকটা ছড়ানোভাবে হলেও জমিদার রবীন্দ্রনাথের একটা চেহারা পাওয়া যায়। কবির ব্যক্তিগত জীবনের বৈষয়িক পটভূমি বোঝাবার জন্য লেখক অনেক তথ্য জড়ো করেছেন। দেখিয়েছেন, জমিজমা এবং ব্যাবসার আয় মিলিয়ে দ্বারকানাথের বিস্ময়কর বৈভব কালে ক্ষয়ে এসেছিল। দেবেন্দ্রনাথ-গিরীন্দ্রনাথের আমল থেকে এঁরা একান্তভাবে জমির আয়ের উপরে নির্ভর করেছেন। আর-সব জমিদারির মতোই ঠাকুর-এস্টেটেও খাজনা বাড়ানোর জবরদস্তি ছিল। শাসনপীড়নের ব্যবস্থাও ছিল কড়া রকমের। ১৮৭৩ সালে পাবনায় কৃষক-বিদ্রোহ এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ প্রজা-বিদ্রোহে রবীন্দ্রনাথের কোনো দায়িত্ব থাকতে পারেনা, কারণ, তখন "রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর।" বরং লেখক মনে করেন, সরাসরি জমিদারির দায়িত্ব নেবার পরে তিনি এমন-কিছু পরিবর্তন আনেন, যা "দুঃসাহসিক ও প্রশংসনীয়।" "সৌন্দর্যের সম্বন্ধ" প্রবন্ধে পুণ্যাহ উপলক্ষে প্রজাদের কাছ থেকে টাকা উসুলের অনুষ্ঠান "অপার্থিব সৌষ্ঠবে সুষমায় আচ্ছাদিত" করে দেখানো লেখকের ভালো লাগেনি। তবুও তিনি মানছেন, "এই সীমার মধ্যে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্র-নাথের ভূমিকা অন্যান্য জমিদার থেকে শুধু স্বতন্ত্র নয়, বিশেষ প্রশংসনীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন। প্রচলিত কৃষিসম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন তাঁর সাধ্যের অতীত আর তা তাঁর আশু চিন্তায় বর্তমানও ছিলনা ; কিন্তু ঐ বিশেষ সম্পর্ক জমিদারের উপর যে নৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে, জমিদারের পক্ষে তা অবশ্যপালনীয়। এ ব্যাপারে তিনি পূর্বাপর সচেতন ছিলেন।" (পৃ. ২৫)। বইয়ের শেষ দিকে 'রায়তের কথা' (১৯২৬) প্রবন্ধ স্মরণ করে লেখক আরও বলেছেন, "জমিদারি সম্পর্কে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে এ ব্যাপারে প্রগাঢ় কোনো আসক্তি রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই ছিলনা। বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার বাধ্যবাধকতার জন্যই তিনি জমিদার।" (পৃ. ৩৪৪)। রবীন্দ্ররচনার ঘনিষ্ঠ পাঠক মনে করতে পারবেন, বিভিন্ন সময়ে তিনি জমিদারদের চরিত্র সম্পর্কে "জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব"; "গবর্মেন্টের বড়ো কর্মচারী" ; "ইংরেজ রাজ সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা"— এ রকম ধিক্কার দিয়েছেন। ভদ্রলোকের রাজনীতিতে বিত্তবানদের ভূমিকা নিয়ে বিদ্রূপ করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ জমিদার প্রসঙ্গ আনেন, "এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যাঁরা যোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কলকারখানা ; আর

শব্দ যাঁরা জোগান তাঁরা আইন ব্যবসায়ী।" ('রায়তের কথা')। আর রাশিয়ার অভিজ্ঞতা যে তাঁর মনে পরাশ্রিত জীবনযাপন সম্পর্কে কী গভীর গ্লানিবোধ জন্মিয়েছিল, চিঠিপত্রে তার নজির সকলেরই জানা। শ্রীযুক্ত পোদ্দার এই তথ্যগুলি সাজিয়েছেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে। শেষবারে পতিসরে গিয়ে (১৯৩৭) প্রজাদের উদ্দেশে বলা মর্মস্পর্শী ভাষণ লেখক অমিতাভ চৌধুরীর বই থেকে তুলে দিয়েছেন, "ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতোই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে।" "তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি" বলে আক্ষেপ করেন তিনি। লেখকের এই বিন্যাস থেকে ধারণা হয়—জমিদারির আয়ে জীবনধারণ সত্ত্বেও মানসিকতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ কখনও "জমির জোঁক" বা "ইংরেজ রাজসরকারের গোমস্তা" জাতীয় জমিদার ছিলেন না। শ্রীযুক্ত পোদ্দার দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ঠাকুর এস্টেটের আয় বেড়েছিল, কিন্তু বাড়তি আয়ের "অধিকাংশই— কিন্তু সম্পূর্ণটা নয়—" প্রজা কল্যাণে খরচ করা হত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়ত পেষাই ব্যবস্থার মাথায় যে জমিদারদের বসানো হয়েছিল, তাদের সগোত্র হওয়া সত্ত্বেও - লেখকেরই বিবরণ অনুসারে — রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে স্বতন্ত্র, অনাসক্ত। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, জন্মসূত্রে রবীন্দ্রনাথ যে শোষণতন্ত্রের অঙ্গ হিশেবে পরিচিত, সেই ব্যবস্থার সঙ্গে "কোনো দিনই" তাঁর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ছিলনা। পারিবারিক দায়িত্বের সূত্রে জমিদারি পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনও এমন কিছু করেন নি যাকে বলা যায় অমানবিক আচরণ বা শোষণমূলক কাজ। তেমন কোনো ঘটনার উল্লেখ এ বইয়ে নেই। অরবিন্দবাবুর বিবরণ থেকে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে রবীন্দ্রনাথ মানসিকতায় এবং আচরণে আপন শ্রেণীর সীমার বাইরে আসতে পেরেছিলেন।

জমিদার শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করতে পারল না, তিনি শোষণজীবী শ্রেণী-মানসিকতার বাইরে রয়ে গেলেন, অথচ "ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে জমিদাররূপে তাঁর অবস্থান" অনড় রয়ে গেল - এই তত্ত্ব টেকে কী করে - অরবিন্দবাবুর নিজেরই দেওয়া তথ্যে যে তাঁর যুক্তিকাঠামো ভেঙে যায়। এই স্ববিরোধ থেকে বেরতে পারা সহজ নয়, তাই তাঁকে পদে পদে জোড়াতালি লাগাতে হয়। যুক্তি ছেড়ে বিক্ষোভের ভাষা আশ্রয় করেন, "বিস্ময়ে বিমূঢ়" হতে থাকেন ক্রমাগত।

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব নির্দেশে অরবিন্দবাবুর ভাষায় তোলস্তোই বিষয়ে লেনিনের লেখার বিচ্ছিন্ন পঙক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "On the one hand, we have the great artist, the genius who has not only

drawn incomparable pictures of Russian life but has made first-class contribution to world literature. On the other hand we have the landlord obssessed with Christ...On the one hand, merciless criticism of capitalist exploitation, exposure of government outrages and unmasking of the... degradation and misery among the working masses. On the other, the crackpot preaching of submission, 'resist not evil' with violence." ('Leo Tolstoy as the mirror of the Russian revolution')। খৃস্টে মজে থাকা জমিদারের জায়গায় অরবিন্দবাবুর রবীন্দ্রনাথ হলেন পরম ব্রহ্মে মজে থাকা জমিদার। দুঃখ জর্জর ভারতীয় জনগণের স্বপ্নের রূপকার ; কিন্তু বশ্যতা শেখান, অমঙ্গল প্রতিরোধে হিংসার আশ্রয় না নেবার পরামর্শ দেন। এভাবে ছক মেলানোর পণ্ডশ্রম ছেড়ে লেনিন আর-একটু তলিয়ে পড়লে তার দৃষ্টির সাহায্যেই বুঝতে পারা যায়, য়ুরোপীয় শিক্ষায় পোষিত কোনো লেখকের মতো তোলস্তোই রাশিয়ার সংকট বুঝতে চাননা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ আধুনিক মননের আলোয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটে ভারতীয় জীবনের সংকট বুঝে নিতে উৎসুক। সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই থেকে তোলস্তোই উত্তীর্ণ হন রাজনীতি-বিতৃষ্ণায়, রবীন্দ্রনাথে দেখা যায় জীবনের পর্বে পর্বে রাজনীতিতে আগ্রহের ক্রমবিস্তার। সরকারি চার্চের বিরুদ্ধতায় সঙ্গে তোলস্তোই এমন এক ধর্মমত প্রচার করেন যা, লেনিনের ভাষায়, নির্যাতিত জনগণের পক্ষে পরিস্রুত, সূক্ষ্ম, নতুন বিষ। রবীন্দ্রনাথও ধর্মের কথা বলেন, কিন্তু ধর্ম তাঁর উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। আচারগত ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-নাথের নিরন্তর লড়াই মূলত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধেরই বিরুদ্ধে লড়াই। জমিদারি মানসিকতার বাইরে না এলে সামন্ত মূল্যবোধ এভাবে বিধ্বস্ত করা যায়না।

কোনো ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা বিচারে মূল প্রশ্ন, নির্দিষ্টকালের সীমায় সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব এবং নতুন মূল্যবোধে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া চলে, ব্যক্তি-বিশেষ সেই দ্বন্দ্বে নতুন মূল্যবোধের অভিমুখী শক্তিগুলির পক্ষে আছেন, না বিপক্ষে। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ভারতীয় বাস্তবতায় মধ্যযুগীয় সামাজিক বিন্যাসের জের এবং আধুনিকতামুখী আংশিক পরিবর্তন সমাজের স্তরে স্তরে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। দেশীয় সমাজের ভেতরের দ্বন্দ্ব এই বাস্তবতার এক দিক। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয় জনগণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। পরাধীন দেশের জনমনে যেখানে যেভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রস্ফুট হোক, সে বোধ মহামূল্য ও শ্রেয় বলে মান্য।

সাম্প্রতিক গবেষণায় ক্রমে এই সত্য উন্মোচিত হচ্ছে, ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে সারা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বহু ছোটো বড়ো অভ্যুত্থান ঘটেছে। অভ্যুত্থানগুলি কোনো-না-কোনোভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনে আঘাত হেনেছে। প্রস্তুতিহীন, উপযুক্ত নেতৃত্বহীন সেসব বিদ্রোহের পরিণতি ঘটেছিল সিপাহি বিদ্রোহের ব্যাপক বিস্ফোরণে। সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই ভারতীয় পরিস্থিতিতে প্রগতিধর্মী মূল্যবোধের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের বাবু-ভদ্রজনেরা, ইংরেজ রাজত্বের নতুন বিধিব্যবস্থায় চাকরি, জমির স্বত্ব বা ছোটোখাটো ব্যাবসায় যাঁরা সচ্ছল জীবনের সুযোগ পেয়েছিলেন — তাঁরা এই নতুন মূল্যবোধের বিরোধিতা করেছেন। সিপাহিদের "হঠকারিতার" বিরুদ্ধে তখনকার কাগজে কাগজে তীব্র চেঁচামেচি, বা কোম্পানির শাসনের জায়গায় খোদ মহারানীর শাসন চালু হওয়ায়, "দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন" ('নীলদর্পণে'র মুখবন্ধ) বলে আহ্লাদ প্রকাশে সেকালের বাবু-ভদ্রজনের মনের টান কোন মুখে ছিল, বোঝা যায়। ভদ্রজনের রাজনৈতিক সোরগোলে হাতে আসা সুযোগগুলো আর একটু বাড়ানোর বেশি কোনো আকাঙ্ক্ষা গোড়ায় ছিলনা। চাষাভুষোর মহৎ প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের প্রেরণা সে আন্দোলনে বর্তায় নি। ইংরেজ বর্জিত ভারত ছিল এঁদের স্বপ্নেরও অগোচর, কারণ, এঁদের জীবনের যাবতীয় স্বপ্নের বনিয়াদ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের উপজাত সুযোগে। জন্মসূত্রে এই জনস্তরের মানুষ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণারও বিকাশ শুরু হয়েছিল মূল প্রগতিধর্মী মূল্যবোধের বিরোধী বাতাবরণে। ভদ্রলোকের রাজনীতির কাঙালপনায় পীড়িতবোধে এবং দুস্থ স্বদেশের দুর্গত গণসমাজের প্রকৃত স্বরূপ জানবার বোঝবার ব্যাকুলতায় সেই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন একেবারেই স্বতন্ত্র মানুষ। অব্যবহিত নানান স্বার্থের টানাটানির মধ্যে বসবাস করেও অমিত সৃজনপ্রতিভার আধার তাঁর ব্যক্তিত্বে জাগে স্বচ্ছ, বিকলতাহীন সংহতিতে উত্তরণের প্রয়োজন বোধ। আপন সত্তার সৃজনধর্ম চরিতার্থ করার জন্যই তাঁকে নিজের "ভিতর মহলের আলো" জ্বালিয়ে তুলতে হয়। সৃজনপ্রতিভার এই আত্মোপলব্ধির অভিজ্ঞতা, "নীহারিকার মাঝখানে নক্ষত্রের অভিব্যক্তির" মতো। সে আলো গৌণ বাধা ভেদ করে জীবনের সত্যাসত্য চিনিয়ে দেয়, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপকতা আয়ত্তের মধ্যে এনে দেয়। স্রষ্টা-ব্যক্তিত্বের সৃজনধর্ম সক্রিয় থাকে নিরন্তর নিজেকে জানা এবং নিজেকে জানার জন্যই "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া না"র প্রক্রিয়ায়। আপনার সঙ্গে বাহির বিশ্বের শৃঙ্খলা গড়ে তোলার এই সজ্ঞান সচেতন প্রযত্নে আত্মবিকাশের গতি অব্যাহত থাকে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মরতিতে প্রতিভার অপঘাত অনিবার্য। মুক্তি এবং চরিতার্থতা বাস্তবকে মুঠিতে ধরায়, বাস্তবকে ব্যবহার

করায়, শিল্পের নিয়মে বাঁধায়। বড়ো শিল্পীর সৃষ্টিতে তাঁর সমকালের সঠিক তাৎপর্য যে প্রতিফলিত হয়, সে বাস্তবকে মুঠিতে ধরার ক্ষমতারই ফল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রতিভাত ভারতবর্ষ দেশটির, দেশের মানুষের শক্তির দিক, দুর্বলতার দিক, সংকটের আবর্ত যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে নিতে আজও সাহায্য করে। তাঁর সময়ের সমাজবাস্তবতার ভেতরে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার বহুমুখী দ্বন্দ্বের সত্যাসত্য সঠিক তাৎপর্যে তিনি রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যে-গানে-ছবিতে শিল্পগত উৎকর্ষের অন্তঃসারকে বলা যায় আধুনিক মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। সে অভিব্যক্তি নির্বাধ নয়, পদে পদে বিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়ায়ের ভেতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। তাঁর সৃষ্টির ভুবনে মানুষের আত্মমর্যাদার বিরুদ্ধ-শক্তির যাবতীয় চিত্রকল্প ধারণ করে আছে সামন্ত মূল্যবোধের স্পর্ধা এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবন্ধ। বিরুদ্ধ-শক্তির চাপ ভারতীয় পরিস্থিতিতে তীব্র বলেই মনুষ্যত্বের মর্যাদার লড়াইটা এত জটিল, এত ত্বরান্বিত।

কোনো বিচ্ছিন্ন একটি রচনায় নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায়, সব কটি আয়তনে মানুষের সংগ্রামের সেই জটিল বাস্তবতা রূপায়িত রয়েছে। এই বাস্তবতায় নানামুখী contradiction ছিল এবং আজও আছে। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বৈপরীত্যের সংঘাতের ভেতর দিয়ে স্ফুরিত বৈকল্য-মুক্ত সমুন্নত মনুষ্যত্বের মহিমাকে জয়যুক্ত করেন, তার শক্তি এবং সৌন্দর্যকে রূপ দেন — তারই দক্ষ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের প্রগতি ভূমিকা যথাযথ ধরা দিতে পারে। স্রষ্টা-মানস বৈপরীত্যের চাপে পর্যুদস্ত নয় বলেই, বৈপরীত্যের ঊর্ধ্বে উঠে দৃষ্টির শুদ্ধতা অর্জন করতে পারতেন বলেই বৈপরীত্য-ক্লিষ্ট পরিস্থিতির অন্তঃসারকে তিনি শিল্পের বিষয় রূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উজ্জ্বল সৃষ্টিগুলির, সাহিত্যের-গানের-ছবির মর্ম উন্মোচন ভিন্ন as the mirror of the Indian revolution — রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হতে পারেনা।

অরবিন্দবাবুর পরিশ্রমের অতি সামান্য ভাগ ব্যয় হয়েছে রবীন্দ্র-সৃষ্টি বিচারে। যেটুকু বা করেছেন তাও অতি অগভীর। যেমন তাঁর 'মুক্তধারা' পাঠ (পৃ. ২৫২-৫৩)। শুধু ভারতীয় পরিস্থিতির নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে সংকটের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে এই নাটকের বক্তব্য-মেরু তৈরি, তিনি তার ধারেকাছেও যাননা। রবীন্দ্রনাথ নাকি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় কাপড় পোড়ানোর ঘটনায় গান্ধিজির সঙ্গে "অশালীন" "ঔদ্ধত্যপূর্ণ" ব্যবহার করেছিলেন। বইটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ দুটি বিশেষণের প্রয়োগ লাগাতার। সমগ্র অসহযোগ আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করাই নাকি তখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। এবং লেখক এরই জের দেখেন 'মুক্তধারা' নাটকে।

যে সৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল্যগৌরব, সেই ভুবনের ভেতরে না গিয়ে

অরবিন্দবাবু গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছেন কালানুক্রমিক রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলির মধ্যে। সাক্ষাৎ সমস্যার এইসব বিচার-বিতর্কে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের একটা আয়তন বা ডাইমেনশন অবশ্যই ধরা যায়, কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকে নয়। এই স্তরের আলোচনা-পদ্ধতিতে অরবিন্দবাবু নানান স্ববিরোধে পড়েছেন। তবুও তাঁর ঝোঁক হল রবীন্দ্রনাথের প্রগতি-ভূমিকা বড়ো করে দেখানো। ভারতে বিপ্লবী চেতনার উৎসে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার অনেক নজির তিনি সঞ্চয় করেছেন বইটিতে। রবীন্দ্রনাথের বিচ্যুতি ধরতে পারলে যেমন তিনি মাত্রাতিরিক্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন, প্রশংসার বেলাতেও তেমনি মাত্রা ছাড়ানো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির নেতৃভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে দেখা তবুও অসম্পূর্ণ দেখা। যে সময়ের পটে তাঁর জীবন-যাপন, মানব ইতিহাসের সেই পর্বের যা-কিছু গ্লানি ও গৌরব, পতনের যন্ত্রণা ও অভ্যুদয়ের মহিমা — নিজের মধ্যে তিনি আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন। সেই তাঁর সৃষ্টির উপাদান এবং উপাদানের ব্যাপ্তিতেই তাঁর সৃষ্টির মহত্ত্ব। সৃজন-প্রতিভা-স্পৃষ্ট মনের দৃষ্টি যে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে অনেক দূরে যায়, জীবন-সত্যের সমগ্রতা দেখতে পায় — এ প্রত্যয় মার্কসীয় বীক্ষায়ও অস্বীকৃত নয়। সেই সমগ্র দৃষ্টিতে প্রতিভাত আপন সময়ের মানবযাত্রার তাৎপর্যের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারি দিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রি রাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারেনি বিদ্রূপ করিবারে—
যত-কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।
("জয়ধ্বনি", 'নবজাতক')

অরবিন্দ পোদ্দার 'রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' উচ্চারণ, ১৯৮২।

প্রতিক্ষণ
২ আগস্ট ১৯৮৪।

রবীন্দ্রনাথ
জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে কিছু কাজকর্ম যাঁরা করেন তাঁরা তথ্য সংগ্রহে চিন্মোহন সেহানবীশের নিরলস উদ্যমের খবর রাখেন। অকৃপণ সাহায্যও পেয়েছেন অনেকে তাঁর কাছ থেকে। তাঁর নিজের লেখার পরিমাণ অবশ্য বেশি নয়। সংগ্রহ-সঞ্চয়ে যত সময় দিয়েছেন, গুছিয়ে লিখতে বসার জন্য তত সময় দেননি কখনও। তাই অল্প সময়ের মধ্যে পর পর তাঁর দুটি বই হাতে পাওয়া তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা। দুটি বই-ই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' (জানুয়ারি ১৯৮৩) এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' (মে ১৯৮৫)। আমাদের দীর্ঘ জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ধারা সশস্ত্র সংঘাতের পথে বিদেশি শাসন উৎখাতের চেষ্টা — যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "অতিশয় পন্থা"। এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্র- নাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের ইতিহাস দ্বিতীয় বইটি আগে পড়া যেতে পারে, কারণ, জাতীয়তার ভাবনার ভিতের উপরেই আন্তর্জাতিকতার ভাবনা গড়ে ওঠে। তরুণ বয়সের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে শেষ বয়সের 'রাশিয়ার চিঠি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের জটিল বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্ব-পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্বদেশ জিজ্ঞাসাই সম্প্রসারিত হয় সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাসের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসায়।

২

আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "আমি কবি মাত্র"। রাজনীতি যে তাঁর কাজের এলাকা নয়, বিশেষ করে একথা তিনি অনেক প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন এই স্বদেশের ইতিহাস কত বিঘ্নে প্রতিহত হতে হতে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ভারতীয় মনুষ্যত্বে আধুনিক মর্যাদা জাগছে কত দুঃখের অভিজ্ঞতায় — কবি হিশেবে সে বাস্তবের সারবস্তু দূরে থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে এক শিল্পের ভুবন রচনা করে তোলা অসম্ভব ছিলনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। আঘাত সংঘাতের মাঝখানে এসে দাঁড়ানোর, দ্বন্দ্বময় বাস্তবে সাক্ষাৎ ভূমিকা নেবার দায় না মেনেও একজন স্রষ্টা আপন সময়ের সত্যপ্রকাশ যে করতে পারেন শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির এলাকায় তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই কিছু। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জি তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূর্তি তুলে ধরে সে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের চেহারা নয়। সামাজিক মানুষ হিশেবেই তিনি সাড়া দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ দায় কখনও অস্বীকার করেন নি। কখনও কখনও ঘটনার টানে একটু বেশিই জড়িয়ে যেতেন, প্রায় নেতৃভূমিকায় এসে দাঁড়াতেন, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গের

সময়ে। পরাধীন স্বদেশের জটিল বাস্তবতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি ও তত্ত্বগত অবস্থান দেশের নেতারা প্রায়ই অগ্রাহ্য করেছেন। সেই বঙ্গভঙ্গের দিন থেকে গান্ধিপর্ব অবধি রবীন্দ্রনাথ চলতি হাওয়ার পন্থী হতে পারেন নি। অপ্রীতিকর কথা বারবার বলেছেন, তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে জেনেও। তাঁর মত চাওয়া হোক বা-না-হোক, চুপ করে থাকেন নি কখনও। সাড়া দেবার এই অনিবার্য প্রবণতার সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর সাহিত্যিক-সাংগীতিক সৃষ্টির পাশাপাশি স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে ধারাবাহিক অবলোকনে — প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, প্রাসঙ্গিক বাদ-প্রতিবাদে। উপন্যাসে তো বটেই, কবিতায়-গানেও অনেক সময়ে এসব সংকটময় আবর্তের ছাপ সরাসরি পড়েছে। রবীন্দ্র-চর্চার এই একটি বিশিষ্ট দিক, সঞ্চিত তথ্য সাজিয়ে বোঝা কীভাবে তিনি সমকালীন বাস্তবকে দেখেছেন।

চিন্মোহন সেহানবীশের বিবেচ্য বিষয় স্বাদেশিক আলোড়নের একটি মাত্র ধারা — বিপ্লবী উদ্যোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। কিন্তু এমনই বিষয় এটি যে আলোচনায় একপেশে ঝোঁক এড়ানো বেশ কঠিন। লাগসই উদ্ধৃতির তোড়ে রবীন্দ্রনাথকে এক মহান বিপ্লবী প্রমাণ করে দিয়েছেন অনেকে। আবার বিপ্লবীদের কঠোরতম সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এমন প্রতিপাদ্যও পাওয়া যাবে কারও কারও লেখায়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ এমন কোনো সরল ধারণা মাথায় নিয়ে কাজটিতে হাত দেননি। বস্তুত কোনো অটল সিদ্ধান্ত বের করে আনার ত্বরা নেই তাঁর। লেখার ধরন তাই নিরাবেগ, ধীরস্থির। পাঠককে তিনি অনুপুঙ্খ তথ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেন, ভাবতে সাহায্য করেন, কিন্তু নিজের ভাবনা চাপিয়ে দেননা। প্রায়ই তিনি ইঙ্গিতময় প্রশ্ন তুলে থেমে গিয়েছেন। নয়তো একটি দুটি মাত্র বাক্যে নিজের মত বলেছেন। তথ্যের কালানুক্রমিক বিন্যাসে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির ইতিহাসগত তাৎপর্য যেমন ফুটে ওঠে তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার বিবরণে স্পষ্ট হয় — মহৎ আত্মত্যাগের শক্তিতে সমুজ্জ্বল যুবকদের জন্য ব্যথিত গৌরববোধের সঙ্গেই এ অতিশয় পন্থা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা এবং দুর্ভাবনা।

লেখক যে-সময়ের তথ্য যত্ন করে গুছিয়ে সামনে ধরেছেন এই বইয়ে, আমরা সে সময় থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। দেশের বাস্তবতায় আজ মুখ্য দ্বন্দ্বগুলোর চেহারা আলাদা। কিন্তু দুর্গতির তীব্র চাপে যেন অনিবার্য উপায় হিসেবেই সেই অতিশয় পন্থা ফিরে ফিরে আসে আমাদের সামনে। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, কিছু মানুষের বীরত্বময় আত্মোৎসর্গে সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সেই একই দুর্ভাবনাও যেন ফিরে আসে — দুর্গতির আসান এ পথে কতটা সম্ভব! আমাদের সময়েরও সমস্যার তির্যক প্রতিফলন তাই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, যাতে বিষয়টির চর্চা একালের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। হয়ত এই কারণেই

অতিশয় পন্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতের ভালোমন্দ নিয়ে সম্প্রতি বেশ কিছু কাজ হল ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সভাসমিতি, প্রস্তাব পাশের রাজনীতির সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ির সংস্রব ছিল গোড়া থেকে। এই রাজনীতিতে ক্রমে ঝোঁকের তফাত দেখা দিল, 'নরমপন্থা' 'চরমপন্থা'-র প্রশ্ন এল। বাংলার চরমপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছেন। চরমপন্থার ভেতর থেকেই বিপ্লবপন্থার, গোপন সশস্ত্র উদ্যোগের ধারাটির সূচনা। এ বইয়ের "জোড়াসাঁকোর পৃষ্ঠপট" এবং "রবীন্দ্রনাথ কি কোনো বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন?" অধ্যায় দুটিতে সংকলিত তথ্যে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ কখনও কোনো বিপ্লবী সংগঠনের ভেতরের মানুষ ছিলেন না। অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন অনেক সময়ে কিন্তু সদস্য হননি। এঁদের গোপন কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলনা। তবুও বিপ্লবপন্থার পথিকদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। অনুশীলন সমিতিই আদিতম বিপ্লবী সংগঠন যার কর্মধারার প্রকাশ্য ও গোপন দুটি স্তর ছিল। বঙ্গভঙ্গের আলোড়নের অনেক আগে থেকে অনুশীলন সমিতির কাজ শুরু হয়েছিল। এই সংগঠনের কেন্দ্রে ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি. মিত্র। 'প্রমথনাথ মিত্র বর্ধাপন ১৯৮০', নৈহাটি, দ্র.) যিনি দেশময় যুবশক্তিকে সংগঠিত করে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রমথনাথের কথা ছিল, "স্বদেশি ফদেশিতে কিছুই হবেনা। ক্ষমতা থাকে তো ইংরেজ তাড়াও আর নয়তো মরো।" ('বর্ধাপন' পৃ. ৫)। এই প্রেরণাই অগ্নিযুগের শুচনা করে। গণেশ ঘোষ বলেন, ১৮৯৭ সালেই প্রমথনাথ উত্তর কলকাতায় একটি গোপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ('বর্ধাপন', পৃ. ৮), তবে অনুশীলন সমিতির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালের মার্চে। এর অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের ভাইপো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমিতির কিছু যোগ থাকা তাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের চরমপন্থীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল, সে সময়ের বহু প্রবন্ধে তিনি খোলাখুলি মডারেট রাজনীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সমর্থন জানিয়েছেন। বাংলার রাজনীতিতে তখন চরমপন্থী, স্বদেশি আর বিপ্লবপন্থী—তিনস্তরেই একই নেতাদের দেখা যেত। মডারেটদের "দরখাস্তপত্র বিছানো" রাজনীতির বিরোধী রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই বামে সরে আসেন। ব্রিটিশ পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ওঠে এবং তাঁর গতিবিধির উপরে নজর রাখা শুরু হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের একটি সার্কুলার উদ্ধার করে দিয়েছেন, তারিখ ২৭ জুলাই ১৯০৯। ২২ জন সন্দেহভাজনের প্রথম নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ১৯তম। তাঁর নামের আগেই গগনেন্দ্রনাথের নাম রয়েছে।

গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের খবর রবীন্দ্রনাথ যে ঠিক ঠিক জানতেন তা প্রমাণ

করবার মতো কোনো তথ্য এ বইয়ে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ইংরেজ পক্ষের দমনপীড়নের উগ্রতা এ সময়ে যেমন নিন্দিত হয়েছে তেমনি দেশের যুবশক্তি যে পুলিশি বিভীষিকায় "অভিভূত না হয়ে অসহিষ্ণু" হয়ে উঠছে তাতে তিনি আশ্বাসেরই কারণ দেখছিলেন। কারণ, এতে প্রমাণ হচ্ছিল, "বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।"

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাবের ব্যাপ্তির কথা মনে রাখলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর লেখার এইসব ব্যঞ্জনাময় তীব্র মন্তব্য থেকে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত যুবকদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশের আগুনে ইন্ধন পেত। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটল মজঃফরপুরে, ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র চাকী ভুল গাড়িতে বোমা মারলেন। মারা গেলেন দুজন ইংরেজ মহিলা। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় মানিকতলার মুরারি বাগানে বোমার কারখানা পুলিশ আবিষ্কার করল, ধরপাকড় হল। এ ঘটনার প্রায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন, এই সব ঘটনা সংঘটনে আমাদের কোন বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।" ("পথ ও পাথেয়")। বড়ো বড়ো নেতা এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব এড়াতে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষণীয়, নিজের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন না। কিন্তু স্বাধীনতার অভীষ্টে পৌঁছুবার পথ সংক্ষেপের চেষ্টায় যাঁরা গুপ্ত হত্যার রাস্তা ধরেছেন তাঁদের "ধৈর্যহীন উন্মত্ততা" এবং "অন্ধতা" তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।* এই প্রবন্ধ এবং 'সমস্যা' নামে এর পরের আর একটি

---

* সংযোজন : ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কালীমোহন ঘোষকে একটি চিঠিতে লেখেন—
"মজঃফরপুরে বম্ব্ ফেলিয়া দুইটি ইংরেজ স্ত্রীলোককে হত্যা করা হইয়াছে শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আছে। এইরূপ অধর্ম ও কাপুরুষতার সাহায্যে যাহারা দেশকে বড়ো করিতে চায় তাহাদের কিসে চৈতন্য হইবে জানিনা। কিন্তু তাহারা সমস্ত দেশকে বিষম দুঃখে ফেলিবে। ধর্মের মুখ চাহিয়া দুঃখ সহা যায় কিন্তু এমন পাপের বোঝা দেশ কী করিয়া বহন করিবে?...জগতে এমন কিছুই থাকিতে পারেনা যাহাকে লাভ করিবার চেষ্টায় ধর্মকে বিসর্জন দিতে হয়।
"...দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নাই — এই কল্যাণ প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা ধর্মের দ্বারাই হইবে। দেশহিতের নাম করিয়া লোকের মনে যে পাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে তাহা দেখিয়া চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত পাপ প্রবৃত্তির বহু ঊর্ধ্বে তোমার আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া মহীয়ান করিয়া রাখো কিছুতে বিচলিত হইয়ো না। চারিদিকে নিদারুণ উন্মত্ততা তোমাকে স্পর্শ না করুক — ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩১৫।" (শারদীয় দেশ, ১৩৯৯ পৃ. ২৪)।

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখান, উদ্ভূত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূলে আছে ইংরেজের নিষ্ঠুর শোষণ এবং ইংরেজ শাসনযন্ত্রের ঔদ্ধত্য। অন্যদিকে, আমাদের হৃদয়াবেগ যত প্রবলই হোক স্বাদেশিকতার ভিত্তি যে নড়বড়ে, আমাদের প্রস্তুতিও যে অসম্পূর্ণ — একথাও জোর দিয়েই বললেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাম্প্রদায়িক তিক্ততায় চুপসে গেল, হিন্দুতে-মুসলমানে, উচ্চবর্ণে-নিম্নবর্ণে সংঘাতের বাস্তব বাধা অতিক্রম করা গেলনা — এ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক ভাবনায় স্থায়ী জের রেখে গেছে। তাই তিনি এমনও বলেন যে, "ইংরেজ শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে।" কলম তৈরি করতে দুটি ডালকে যেমন দড়ির বাঁধনে বাঁধতে হয়, ইংরেজ-শাসন ভারতে সেই শক্ত বাঁধনের ভূমিকায় যদি কিছুদিন থাকে এবং তার ফলে যদি বিযুক্ত জনসমূহের মধ্যে জৈবিকভাবের "একত্রসংঘটন" সম্ভব হয় তা হলে বরং ইংরেজ-শাসন সাময়িকভাবে তাঁর কাম্যই মনে হচ্ছিল সে-সময়ে। বিপ্লবী রাজনীতির সেই সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ রাশ টেনে যুবকদের ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন। সশস্ত্র হানাহানি অনুমোদন করেন নি।

সময় বয়ে গেল অনেক তারপরে। তাঁর জীবনের তিন দশক ধরে চোখের সামনে ইংরেজ শাসনের চণ্ডনীতির বীভৎস প্রকাশ দেখলেন। বিপ্লবীদের গোপন তৎপরতাও চলে এসেছে ১৯৩৪-এ অ্যান্ডারসন হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সভ্য শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম দায়-দায়িত্ব বর্জিত ইংরেজ-শাসনের আর কোনো নৈতিক ভিত্তি ছিলনা। কলমের জোড় লাগানোর জন্য ইংরেজ-শাসনের শক্ত বাঁধনের উপমা তাঁর নিজের কাছেই ক্রমে অর্থহীন হয়ে যায়। ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্গতির মূল কারণ যে ইংরেজ-শাসন, এই সিদ্ধান্ত বার বার উচ্চারিত হয়েছে তাঁর শেষ দিকের লেখায়, 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত। তাঁর লেখা থেকে দেখানো যায়, জীবনের উত্তরপর্বে তিনি পরাধীন স্বদেশের মূল দ্বন্দ্ব — সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব — ঠিক ঠিক চিহ্নিত করেছেন। তবুও কেন ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য যাঁরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন তাঁদের তিনি সমর্থন করতে পারলেন না? লক্ষ্যের মিল সত্ত্বেও কেন অতিশয় পন্থা সম্পর্কে কবির আপত্তি রয়েই গেল? ১৯৩৯ সালেও তিনি মন্তব্য করেন, " পরবর্তীকালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল — ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করল বিপথ।" ("দেশনায়ক", 'কালান্তর')। চিন্মোহন সেহানবীশ ঠিকই লক্ষ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল কথাটা বিখ্যাত "সত্যের

আহ্বান" ('কালান্তর') প্রবন্ধ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে লেখক স্বভাবসিদ্ধ অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যোগ করেছেন, " এবারে আরও একটি যুক্তি যে তিনি দিয়েছেন, সেটি বিশেষ লক্ষণীয় ; মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী কয়েকজন তরুণের চূড়ান্ত আত্মদানের মারফত সারা দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সারা দেশবাসীর জাগরণ। আর তারজন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ তপস্যার।" (পৃ. ৪১)। চরকাই স্বাধীনতা এনে দেবে -- গান্ধিজির এই নীতির সমালোচনায় লেখা "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধের ১১ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বললেন, প্রলয়হুতাশনে যে বিপ্লবীরা আত্মহুতি দিয়েছিলেন তাঁরা সব দেশের সকল মানুষের নমস্য। কিন্তু তাঁদের পরম দুঃখের অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হয়েছে, দেশ যখন তৈরি হয়নি তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেওয়ায় লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়না। "সমস্ত দেশের অন্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার কোনো একটা অংশ থেকে নয়।" চরম দণ্ড থেকে রেহাই পাওয়া বিপ্লবীদের লেখা পড়ে এবং তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তখন কবির মনে হয়েছিল, "তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ।" গোটা দেশের মানুষকে সঙ্গে নেওয়া ভিন্ন মুক্তির কোনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা যে নেই — বিপ্লবীদের সঙ্গে এইখানে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মূলে তফাত। গণভিত্তিহীন আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলির নেতা ও কর্মীদের অনেকের অনৈতিক কাজকর্মের খবর রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবীদের সূত্রেই পেতেন সম্ভবত — যার প্রতিফলন রয়েছে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। যেমন হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইটির তথ্য। (নেপাল মজুমদার মশায়ের লেখা "চার অধ্যায় ; প্রাসঙ্গিক তথ্য", শারদীয় যুবমানস' ১৯৮৫ দ্র.)।

বিপ্লবী রাজনীতির একটি বড়ো যুক্তি ছিল, অপ্রতিহত ইংরেজ শাসন কোনো একটা ছোটো জায়গায় যদি অচল করে দেওয়া যায়, সৈন্যসামন্তের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও যদি কর্তাব্যক্তিদের ঘায়েল করা যায় -- তবে সেই ঘটনা একটা প্রতীক মূল্য পাবে দেশের মানুষের মনে। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী বা চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়কেরা বা রাইটার্স অভিযানের যোদ্ধা বিনয়কৃষ্ণ বসু-বাদল গুপ্ত-দীনেশচন্দ্র গুপ্তর মতো যুবকেরা ভারতীয় জনগণের মুক্তির সংগ্রামে এক একটি প্রতীকী মূল্যের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সমস্ত দেশের অন্তঃকরণে এইসব বীরহৃদয়ের তেজস্বিতার প্রভাবের ইতিবাচক দিক, এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি কখনও। বিপ্লবীদের প্রত্যাশাহীন দুঃখভোগ এবং চরম আত্মোৎসর্গের সামনে বারবার তিনি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে "দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতা", "অসহিষ্ণু তারুণ্যের হৃদয় বিদারক প্রমাণ" বলেছেন। ভুলভ্রান্তি, কারও কারও ব্যক্তিগত স্খলন এবং তত্ত্বগত ধারণার

যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা ইতিহাসের একটা পর্বে ইতিবাচক মূল্যবোধ সংযোজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক এই সত্য মানতে না পারায় বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায় দ্বৈধ বা দোটানা বরাবর থেকে গেছে। একে শ্রীযুক্ত সেহানবীশ বলেছেন "দ্বৈত-ভাবনা"। "এক দিকে, তিনি তাঁদের অনুসৃত পন্থার কঠোর সমালোচক। অন্য দিকে আবার তাঁর লেখায় ও কাজকর্মে অতি স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট ঐ দুঃসাহসী তরুণদের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর টান। কখনও হয়তো এর এক দিকে, কখনও বা অন্য দিকে ঝোঁক বেশি পড়েছে তাৎক্ষণিকতার তাগিদে।" (পৃ. ১৫)। "রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী" এবং "বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ" অধ্যায় দুটিতে ক্ষুদিরামদের সময় থেকে আন্দামান-দেউলি-প্রেসিডেন্সি-আলিপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট (জুলাই-আগস্ট ১৯৩৭) পর্যন্ত ছোটো-বড়ো নানা ঘটনায় দু-তরফেরই প্রতিক্রিয়ার, যোগাযোগের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য লেখক সঞ্চয়ন করেছেন — সে তথ্যে অবশ্য সব সমালোচনা ছাপিয়ে বিপ্লবীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সহানুভূতি এবং ব্যথিত গৌরববোধ যেমন উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে, তেমনি উজ্জ্বল হয়ে ফোটে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপ্লবীদের গর্বে-গৌরবে মেশা মাননা বোধ।

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের অনেকে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আশ্রয় পেয়েছেন, চাকরি করেছেন। কালীমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রনাথ রায় — এঁদের রাজনৈতিক গতিবিধি জেনেও কবি আশ্রয় দিয়েছিলেন। পুলিশের তাড়ায় দেশ ছেড়ে গিয়েছেন এমন কৃতী মানুষদের রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন অনেক সময়ে।। এরকম একজন মানুষ কেশোরাম সবেরওয়ালের পরিচয় উদ্ধার করেছেন লেখক। (পৃ. ৪৮)। এরই সঙ্গে উল্লেখ করে যাওয়া যায় অনশনে যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে কবির ক্ষোভের প্রকাশ "সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ" গানটি (১৯২৯) বা হিজলি বন্দী-শিবিরে পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে ময়দানে জনসভায় ভাষণ (১৯৩১)। নিগৃহীত আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে জনসভায় আর-এক ভাষণে (১৯৩৭) রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ভারত সরকারের প্রতিহিংসার নীতিকে কবি সরাসরি ফ্যাসিস্ট নীতি বলে ঘোষণা করেন। এসব সহায়তা-সমর্থন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের গভীরতর সম্পর্কের সত্য প্রকাশ পেয়েছে—" বাংলার বিপ্লবীদের জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা জড়ানো "—সূর্য সেনের এই উক্তিতে। (পৃ. ১৭৪)। বিপ্লবীদের জীবনের কত সংকট মুহূর্তে যে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা উজ্জীবন মন্ত্রের কাজ করেছে — তার বিবরণ আছে এই বইয়ের "বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ" অধ্যায়ে। একটি অজানা

তথ্য — ভগৎ সিং কনডেম্‌ড সেল-এ যেসব নোট রেখেছিলেন, সেই খাতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে উধৃতি রয়েছে। এই খাতার একটি উধৃতি "A judge callous to the pain he inflicts, loses the right to judge"—বোধ হয় 'গান্ধারীর আবেদন'-এ গান্ধারীর উক্তি—"ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে, নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার"-এর অনুবাদ।

বিপ্লবীদের দিক থেকে বিরূপতা আদৌ ছিলনা এমন নয়। তেমন উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সমালোচনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর তীব্র মন্তব্য (পৃ. ৯৫-৯৬), আমেরিকা-প্রবাসী গদর দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালইজম' সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনায় ব্রিটিশ-শাসন তাঁকে কিনে নিয়েছে —এই জাতীয় উক্তি (পৃ. ১০০) বা 'চার অধ্যায়' উপন্যাস পড়ে বিপ্লবীদের ক্ষোভ — সরোজ আচার্যর ভাষায়, " আমরা যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।…তিনি এই বই কেন লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে অ্যান্ডারসনী তান্ডব চলছে।" (পৃ. ১৩৬)।* 'চার অধ্যায়ে' বিপ্লবী রাজনীতির প্রসঙ্গ একান্তই গৌণ, "একমাত্র আখ্যানবস্তু এলা ও অতীন্দ্রর ভালোবাসা" — রবীন্দ্রনাথের এই কৈফিয়ত সরোজ আচার্য খন্ডন করেছেন এবং চিন্মোহন সেহানবীশ সরোজ আচার্যকে সমর্থন করেছেন (পৃ. ১৩২)। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন, ইংরেজ প্রশাসন এ বই বিপ্লব দমনের প্রচার পুস্তক হিশেবে ব্যবহার করেছিল এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

তাৎপর্যপূর্ণ আর একটি দৃষ্টান্ত ; কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্যতম প্রধান নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'The Philosophy of Property' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-নাথের 'City and Village' (*Visva-Bharati Quarterly* Oct. 1924) প্রবন্ধের সমালোচনা। গোটা প্রবন্ধটি *Masses of India* (Paris, Jan. 1925) পত্রিকা থেকে পরিশিষ্টে তুলে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ভিত্তিক আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য মানবেন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য। মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের এই ধারালো বিশ্লেষণের মূল্য শ্রীযুক্ত সেহানবীশ স্বীকার করেও বলেছেন, " যে জিনিসের হিসেব তাঁর [মানবেন্দ্রনাথের] লেখায় ছিল না সেটি হল রবীন্দ্রনাথের নিজেকে, নিজের

---

* সংযোজন : বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথে সমর্পিত-প্রাণ মানুষ। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তে তিনিও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে দেশ পত্রিকায় (১১ মে ১৯৩৫) "কবিগুরুর কৈফিয়ত" প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত বিজয়লালের রচনাসংগ্রহ 'রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে আমরা সংকলন করেছি।

মঞ্জুশ্রী মিত্র-র 'বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৩) বইয়ে এবিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যায়।

মতকে ক্রমাগত অতিক্রম করার অপরিসীম ক্ষমতা।" (পৃ. ১১৬)। প্রসঙ্গত রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি বদলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কখনওই কি ছেড়েছিলেন? 'রাশিয়ার চিঠি'-তেও তো লিখেছেন, " সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা — সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তাহলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে।...সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। সেজন্যে জবরদস্তির সীমা নেই।" (৫ সংখ্যক চিঠি)। হিতেন্দ্র মিত্র তাঁর *Tagore Without Illusion* (১৯৮৩) বইয়ে উল্লেখ করেছেন, মানবেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ *Welfare* পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫) সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ প্রতিবাদ সমেত আবার ছাপা হয়েছিল। অবশ্য এ বিতর্ক বেশি দূর গড়ায় নি তখন।

গোপন বিপ্লবী উদ্যোগের ধারাটি ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল। রইল জেলে জেলে বন্দী বিপ্লবীদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনে সর্বদাই রবীন্দ্রনাথ সামিল হয়েছেন। জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে তিনি সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হন (১৯৩৬)। বিপ্লবীদের একটা বড়ো অংশ গণভিত্তিহীন সন্ত্রাসের রাজনীতি ছেড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গতভাবেই গোত্রান্তরিত এই বিপ্লবীদের প্রসঙ্গও এসেছে এ বইয়ে। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যময় বিপ্লবের ফলাফল দেখেছিলেন। সভ্যতার চরম দুর্দিনে কবির জীবন শেষ হল। সেই সংকটের অন্ধকারে কবি শেষ ভরসা রেখেছিলেন রাশিয়ার পরিত্রাতা ভূমিকায়। বলেছিলেন, "পারবে ওরাই পারবে।" (পৃ. ১৪৫)। পৃথিবীর বড়ো দেশগুলির শক্তি-সামর্থ্য এবং আন্তর্জাতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এই উক্তির মর্ম বুঝতে সাহায্য পাওয়া যায় চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' বই থেকে।

৩

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

দেশ বিশ্বের বাইরে নয়, দেশ এবং বিশ্ব — দুটি বিরুদ্ধ ধারণা নয়, বিখ্যাত এ গানটির শুরুতে প্রকাশ পেয়েছিল এই এক শুদ্ধ নির্দ্বন্দ্ব আবেগ। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশ ভারতে জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে এমন নির্দ্বন্দ্ব আবেগে অবিচল থাকা সম্ভব ছিলনা। কারণ, ভারতীয় আধুনিকের চেতনায় 'বিশ্ব' মানে দাঁড়ায় আধুনিক য়ুরোপ, যে য়ুরোপের দৃষ্টি তখন নির্ভর করত এশিয়া-

আফ্রিকা থেকে নির্মমভাবে শুষে নেওয়া শাঁস জলের উপরে। আবার এই য়ুরোপ, বা য়ুরোপের সেরা জাত ইংরেজদের ব্যবহারবিধি থেকেই লেখাপড়া শেখা ভারতীয় "ভদ্রসাধারণ" (রবীন্দ্রনাথের চয়ন করা শব্দ) ন্যায়বিচারের, উদার-নীতির পাঠ নিতেন। সচেতন ভারতীয়দের পক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনতত্ত্বে এবং প্রাচ্যে সে জীবনতত্ত্বের ফলিত চেহারায় গড়মিল হবারই কথা। আশ্চর্য এই যে, সে আমলের বাঘা বাঘা জাতীয় নেতাদের কথায় বা লেখায় এ চেতনার বিশেষ পরিচয় নেই। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, "যেসব মহারথীদের নাম নিয়ে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি তাঁরা কি সত্যই এমন বড়ো ছিলেন না যে তাঁদের কাছ থেকে ও-টুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রত্যাশা করা অন্যায়!" আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের এই পটভূমিতে ১৮-১৯ বছরের সদ্য যুবক রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' ('ভারতী' পত্রিকায় ১৮৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত) "বিলাতী সমাজজীবনের দ্রুতলয়, মানস দিগন্তের প্রসার, বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিকতা, শৃঙ্খলাবোধ, স্ত্রী-স্বাধীনতা" এবং গ্লাডস্টোনের বাগ্মিতা, জন ব্রাইটের উদারনীতি সম্পর্কে মোহ সত্ত্বেও শাসক ও শাসিতের বেলায় ন্যায় বিচার আর উদারনীতির হেরফের সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় অবাকই হতে হয়। শ্রীযুক্ত সেহানবীশের মন্তব্য, "অর্থাৎ আজ থেকে ১০৪ বছর আগে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী শাসনের খাস লীলাক্ষেত্রে বসে ১৮ বছরের তরুণ অন্তত কিছুটা আঁচ করেছেন গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্য রক্ষার মধ্যকার অনিবার্য স্বার্থ-সংঘাত।" (পৃ. ১৬)। এর দু-বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন চীনে ইংরেজদের আফিং-এর ব্যাবসা সম্পর্কে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধ। লেখেন, "এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কথনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল; 'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও'।...ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকট মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছেন।" সমীক্ষার এই তীক্ষ্ণতা এবং ভাষার ধার সে সময়ে ভাবা যেত? বঙ্কিমচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথকে precocious বলতেন, রাজনীতিক ভাবনার বেলায়ও কথাটা সদর্থেই খেটে যায়। নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভেবেছেন, যদিও রাজনীতিকে তিনি নিজের কাজের এলাকা মনে করতেন না।

চিন্মোহন সেহানবীশ রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার বিকাশ চারটি পর্বে ভাগ করেছেন। ১. উনিশ শতকের শেষ অবধি প্রথম পর্ব, যার প্রধান লক্ষণ, ক. বিদেশি আধিপত্যের নৃশংসতা সম্পর্কে ক্রমে বেড়ে ওঠা তীব্র অনুভূতি, খ. বৈষয়িক স্বার্থ এবং জাতিগৌরিতার মিশ্রণে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়নের অসারতা সম্পর্কে চেতনা, গ. য়ুরোপের গণতান্ত্রিক নীতির

সঙ্গে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাত এবং ঘ. মানবিক সম্পদের দিক থেকে বর্তমান সভ্যতার রিক্ততা সম্পর্কে প্রাথমিক বোধ। ২. দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার ১৯১২-১৩ অবধি। এই পর্বে কবির চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ক. প্রবল জাতিগুলির বিরোধী স্বার্থের লড়াই ক্রমেই বাড়বে, খ স্থূল এই লোভকেই আড়াল করা হয় ন্যাশনালিজম বা জাতিপ্রেমের আড়ালে, গ. দুর্বলকে উদরস্থ করার জন্য প্রবল জাতিগুলির ইম্পিরিয়ালিজম তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা, ঘ. উগ্র জাতিপ্রেমের বিষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনেও মিশছে এই ধারণা। ৩. তৃতীয় পর্ব ধরেছেন ১৯২৯ পর্যন্ত, অর্থাৎ রাশিয়ায় যাবার আগে পর্যন্ত, যে পর্বের প্রধান লক্ষণ ; ক. বিশ্বযুদ্ধের আশাঙ্কা, খ. জাতি বিশেষের দুর্বুদ্ধি নয়, ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শোষণের অধিকার রক্ষাই যুদ্ধের কারণ—এই বোধ, গ. জাতি-প্রেমের মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার এবং এই জাতিপ্রেমের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সচেতনতা, ঘ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায়শ্চিত্তে সভ্যতা কলুষমুক্ত হবে এই বিশ্বাসে ভাঙন, ঙ. আন্তর্জাতিক পটভূমি থেকে আলাদা করে নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এই চেতনা, চ. সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা, ছ. ফ্যাশিজমের চরিত্র ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হবার আগ্রহ। ৪. অন্তিম পর্বের সূচনা ধরা হয়েছে ১৯৩০ থেকে, ১৯৩০য়েই কবি সোভিয়েত দেশে যান। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশ বছর সভ্যতার ইতিহাসে এক অন্ধকার, সংকটময় পর্ব — যার পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে। এ পর্বের মূল লক্ষণ : ক. সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় স্বদেশ ও বিশ্ব-পরিস্থিতির নতুন মূল্যায়ন। সোভিয়েত সমাজ যে অন্য কোনো দেশের মতোই নয়, "একেবারে মূলে প্রভেদ" এবং এখানকার বিপ্লবের বাণী যে বিশ্ববাণী, এই একটি দেশ যে "স্বজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে"—মূল্যবান এই অবলোকন পাওয়া গেল তাঁর লেখায় এবং মন্তব্যে। খ. সোভিয়েত ব্যবস্থার মধ্যে একটা জবরদস্তির ব্যাপার তাঁর নজরে আসে এবং তার সমালোচনায় এমনও বলেন, "যে নিষ্ঠুর শাসনের ধারা সেখানে চিরদিন চলে এসেছে, হঠাৎ তিরোভূত না হওয়াই সম্ভব।" (জারতন্ত্রের জের !) তা সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনে সর্বসাধারণের মনের মুক্তি এনে দেওয়া এবং নিষ্ঠুরাচারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন" জবরদস্তি শাসননীতির যে একেবারে বিপরীত এবং "আর কিছু না হোক, অদ্ভুত ভুল বলতে হবে।" (অবশ্য মানুষ শিক্ষিত হলেই যে নিষ্ঠুর শাসনবিধি সম্পর্কে প্রতিবাদ করবে এমন না হতেও পারে। খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসে তার প্রমাণ প্রচুর)। গ. ধনতন্ত্র অনিবার্যত সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয় এবং তার পরিণতিতে আসে যুদ্ধ — আধুনিক সভ্যতার এই ব্যাধির কথা রবীন্দ্রনাথ

আভাসে এর আগেও অনেক জায়গায় বলেছেন। রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় এই ধারণা স্বচ্ছ হল। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট করে বললেন, এ ব্যাধির প্রতিকারের জনাই সাম্রাজ্যের মুঠি থেকে এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি জরুরি। তাঁর ভাবনার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, "এশিয়ার দুর্বলতার মধ্যেই য়ুরোপের মৃত্যুবান।" সংকটাপন্ন বিশ্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্যই দুর্বল জাতিগুলির উঠে দাঁড়ানোর সাহসকে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন মনে হয় তাঁর। পারস্য ভ্রমণের স্মৃতিকথায় ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল সম্পর্কে উদ্দীপনাময় মন্তব্য করেন. "য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়ত বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরিশিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিশ বটে — এই মুক্তির দৃশ্য।" (এই বইয়ের পৃ. ৯২)। ঘ. ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বময় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এলেন। স্পেনে গণতন্ত্র বাঁচাবার লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য তাঁর আহ্বান— "Help the People's Front in Spain, help the Government of the people, cry in a million vioces Halt to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the success of civilisation and culture." (পৃ. ৯৬)। বৃহৎ শক্তিগুলির মিউনিক চুক্তির ভাঁড়ামি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার উপরে হিটলারের হামলার ঘটনায় নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত "cowardly guardian"-দের ধিক্কার দিয়ে চেক জাতির উদ্দেশে বলেন. "I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this......My words have no power to stay the onslaught of the maniacs...।" একইভাবে তিনি জাপানি সামরিকচক্রের চীনের উপরে হামলার প্রতিবাদ করেন। অনিবার্য যা সে ঘটে গেল, শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ মন্তব্য, "একদা চলছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা।" সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সংঘাতে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ানো পৃথিবীতে কবির আয়ু শেষ হল। একেবারে শেষের দিনগুলিতে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কবি গভীর উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত রাশিয়ার খবর শুনতে চাইতেন। রণাঙ্গনে রুশ পক্ষের ভালো খবর পেলে বলতেন, "হবে না ? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।" (পৃ. ১১৬)। এ রবীন্দ্রনাথকে সমকালীন বিশ্বের বাস্তব দ্বন্দ্বে প্রগতি শক্তির পক্ষে একজন পার্টিজান বলতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই। এই পর্ব বিভাগ অবশ্য "কঠোর-ভাবে সুনির্দিষ্ট" নয়, এক পর্বের জের অন্য পর্বেও অনেক দূর চলে এসেছে বা পুরানো ঝোঁক ফিরেও এসেছে পরের পর্বে। চিন্মোহন সেহানবীশের দাঁড়

করানো রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তার এই রূপরেখাটি স্পষ্ট করে তোলে. তরুণ বয়সে এক ভাবুকতার ঘোরে "বিশ্ব", "বিশ্বজনীনতা" তত্ত্বগুলো নিয়ে কবি উদ্বেল হতেন। ক্রমে অভিজ্ঞতার জমিতে সে তত্ত্বকে দাঁড় করাতে গিয়ে কেবলই দেখা দেয় কল্পিত তত্ত্বে এবং বাস্তবে বিরোধ। দেশের মাটি বিশ্বেরই অংশ হলেও বিশ্ব যাদের কব্জায় তাদের সঙ্গে মিলতে পারার মতো বিশ্বজনীনতা তাঁরও অবাস্তব মনে হয়— যদিও তিনি ঐক্যতত্ত্বকেই আধুনিক সভ্যতার মর্মবাণী মনে করতেন। এ মিলনের বাধা দুদিক থেকে। একদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যায় এগিয়ে যাওয়া জাতিগুলির লোভ, অন্য দিকে শোষিত জাতিগুলির ভীরুতা। দুটিই, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, মানবধর্মের পরিপন্থী। ইতিহাসের কুটিল আবর্ত ঠিক ঠিক চিহ্নিত করায় কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথ ভুল করেন। ন্যাশনালিজমের খোলশের আড়ালের সাম্রাজ্যলালসার বিকট রূপ উন্মোচন করেন (*Nationalism*, 1917) কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক কারণ স্পষ্ট হয়না তাঁর বিশ্লেষণে (পৃ. ৬১)। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির চালে মোহগ্রস্ত হন। এমন বিচ্যুতির নজির ছোটো এই বইখানিতে অনেক নির্দেশ করা আছে। কিন্তু রাজনীতির এলাকার ভারতীয় মনীষীদের মধ্যেই বা এই কালে অভ্রান্ত দৃষ্টির অধিকারী কজন ছিলেন? আর, ৭০ পেরিয়ে যখন চেতনার ধার মরে আসার কথা, জীবনের সেই শেষ দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে অভ্রান্ত নির্ণয়ন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে, লেখায় — তার তুল্য নজিরই বা কতটা ছিল এদেশে তখন?

বইখানির মর্যাদা বাড়িয়েছে প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের আঁকা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর ছবি, মস্কোয় আঁকা। নিশ্চিতই এটি সমকালীন বিশ্বে সভ্যতার এক নতুন বনিয়াদ নির্মাণে সোভিয়েতের অপরাহত পৌরুষের প্রতীকী চিত্ররূপ। বইয়ের ভেতরের আর-একটি ছবি, মুসোলিনির কার্টুনটিও তাৎপর্যময়। খড়ের তৈরি এক কাকতাড়ুয়ার আকৃতি এই মুসোলিনির চেহারা মনে করিয়ে দেবে. এঞ্জেলিকা বালাবোনোভাকে (কমিনটার্নের সাধারণ সম্পাদিকা) কবি ভিয়েনায় বলেছিলেন."...the impression he (মুসোলিনি) made upon me— a coward and an actor." (রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ পৃ. ১১৬-১৯)। সেই বিতর্কিত ইতালি পর্ব সম্পর্কে আলোচনায় এ দুটি তথ্য একটা ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। ৫৬ পৃষ্ঠার সামনে ছাপা ফোটো কপিতে পাওয়া যাচ্ছে লেনিনের জন্য তৈরি ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বইয়ের তালিকা। তালিকায় বিশেষভাবে নজরে পড়বে তিলক, গান্ধি, সরোজিনী নাইডু, চিত্তরঞ্জন দাস, লাজপত রাই, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রভৃতির বইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *Cult of Nationalism*। লেখক ক্রেমলিনে

লেনিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে *Nationalism* বইটি দেখেছেন, দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া।

"আন্তর্জাতিকতা, মানবমৈত্রী, জাতীয়তা ও সমাজ প্রগতি" বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির ১৮৭৫ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একটি সাল-ওয়ারি তালিকা আছে পরিশিষ্টে। পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কিছু লেখারও উল্লেখ রয়েছে এই তালিকায়। নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়, তবুও এ বিষয়ে পড়াশুনো শুরু করায় কাজে আসবে তালিকাটি।

চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫।

চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা, নাভানা, ১৯৮৩।

প্রতিক্ষণ
২ মে ১৯৮৬

রবীন্দ্রনাথ

আঙিনা করিয়া ভাগ

"আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি পূজা করি কোন শয়তান" — এ আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের। মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়ার "রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ" বইয়ে উদ্ধৃত (পৃ. ৩৯) একটি কবিতায় শোচনাময় এই পংক্তিটি পাবেন। এ কবিতা মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের এক প্রতিনিধিদলকে কবি উপহার দিয়েছিলেন। *

১৯৩৭ সাল। তখনও ভারতভূমিতে পাকাপাকি আঙিনা ভাগ হয়নি — কিন্তু আত্মঘাতী রাজনীতির সর্বনাশের কিছুই আড়ালে ছিলনা। এই পংক্তিটির আক্ষেপ মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার কেন্দ্রগত তত্ত্ব ছিল — বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রচনাই ভারতবর্ষের সাধনা। এই অবস্থান থেকেই তিনি স্বদেশের যাবতীয় সমস্যার গ্রন্থি মোচন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ঐক্য সাধনার তত্ত্ব তাঁর সমকালীন বাস্তবে যে ভেঙে যাচ্ছে এবং সে ভাঙন রোধ করার মতো কোনো প্রবল প্রতিজ্ঞা যে জেগে উঠছে না এ বোধ এড়ানোও সম্ভব ছিলনা। হিন্দু মুসলমান বিরোধের সংকট তাই তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে। সংকটের মূল নির্ণয়ে তিনি বলেন, "যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে সেই অন্ধতাই ধুতি-চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন যোগাচ্ছে।' (পৃ. ৬৭, কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা চিঠি)। "বুদ্ধির অন্ধত্ব" কোন্ চিকিৎসায়

---

* 'আনার আত্মার মাঝে '.ন হল কাঁটার বেড়া এ
কথন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ় ওরে আত্মঘাতী!
ওই স[illegible]নাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজী দলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।"

কাটিয়ে উঠবে এই দেশে আজও তার কোনো দিশা মিলল না। ব্যাধি যে কী ভয়াবহ তার আঁচ আমরা আজও প্রাত্যহিক পাচ্ছি কখনও বাবরি মসজিদ রাম জন্মভূমি সংঘর্ষে কখনও-বা গৌণ এবং তুচ্ছ কারণ থেকে পাকিয়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশের গোটা পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে আছে আজ। জাতীয় রাজনীতির রাশটাও সরাসরি অন্ধ-বুদ্ধি নেতৃত্বের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা। এমন আতঙ্কময় পরিবেশে ডক্টর মজিরউদ্দীনের বইটি প্রায় ডুবন্ত মানুষের হাতের কাছে আঁকড়ে ধরার মতো কস্তুর মর্যাদা পাবে। রবীন্দ্রচর্চায় ডক্টর মজিরউদ্দীনের উপার্জিত কীর্তি আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর প্রবেশ যে ব্যাপক এবং গভীর আগে ছোটোগল্প বিষয়ে কাজে তার প্রমাণ দিয়েছেন। 'রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ' নামে এই বইটিতেও তাঁর দৃষ্টির শুদ্ধতা এবং তথ্য সন্ধানের নিষ্ঠার পরিচয় আছে। ৬টি প্রবন্ধ নিয়ে এই বই : "রবীন্দ্রসাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও জীবন", "কালান্তর ধর্ম ও স্বরাজ", "আশীর্বচন ও বিনয়সম্ভাষণ", "দ্বন্দ্বমধুরে সেতুবন্ধ রবীন্দ্র নজরুল সম্পর্ক", "চরণতলে বিশাল মরু রবীন্দ্রনাথ ও মধ্যপ্রাচ্য" এবং "রবীন্দ্রকাব্যে আরবি-পারসি শব্দসঞ্চয়ন।"

মজিরউদ্দীনের রচনা অনুসরণ করে জিজ্ঞাসু মানুষ জানবেন ১৯০৭-৮ সাল নাগাদ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাপের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন, "আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই-না কেন, এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না।" (পৃ. ৩৩)। বলেছিলেন, "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।" (পৃ. ৩৪)। স্বদেশি আন্দোলনে মুসলমান তেমন আগ্রহে সাড়া দিলনা — এ নিয়ে নেতাদের ক্ষোভ ছিল। এই বিষম অন্তরায় উত্তরণের উপায় যে কী — কেউ তা ভেবে উঠতে পারেন নি। ফাঁকটা কোথায়, রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই তার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। নিজের জমিদারিতে তিনি দেখেছিলেন মুসলমান প্রজাদের বসবার জায়গায় জাজিমের একটা প্রান্ত গুটিয়ে রাখা থাকে। স্বদেশি আন্দোলনের এক হিন্দু-প্রচারক জল খাবেন বলে সঙ্গী মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়াতে বলেন। গাড়ির চালক মুসলমান জেনে সঙ্গে সঙ্গে এক জমিদার মুখ থেকে পান ফেলে দিলেন। এমন সব লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফাঁকটা ধরিয়ে দেন।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি পূর্ববাংলায় মুসলিম মনীষা বিকাশের উজ্জ্বল ঐতিহ্য বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। সৃজনি এবং মননি সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের হাতের সৃষ্টি এ বিপুল ঐশ্বর্য বাধাহীন বিকাশের সুযোগ ছাড়া কি আদৌ সম্ভব হত? ডক্টর মজিরউদ্দীন তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রবন্ধে খুঁটিনাটি অনেক তথ্য সাজিয়ে দেখিয়েছেন, মুসলিম

সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তু কেমন গভীরভাবে টানত রবীন্দ্রনাথকে। নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের একটি রূপরেখা আছে চতুর্থ প্রবন্ধে। ৭০ বছর বয়সে কবির মধ্যপ্রাচ্যে যাবার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা "চরণতলে বিশাল মরু" প্রবন্ধটি এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্যকে একটা বড়ো পটে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথ ট্যুরিস্ট মনোভাব নিয়ে দেশভ্রমণ করেন নি কখনও। স্বদেশকে বোঝার গরজেই তাঁর বিশ্বপরিক্রমা। স্মরণ করুন, "রাশিয়ার চিঠি"— যে রচনায় প্রতি পদে তিনি এই নতুন অভিজ্ঞতার পাশে তুলে ধরছেন স্বদেশের দুর্দশার কথা। পরাস্য ভ্রমণেও ঠিক একই জিজ্ঞাসা সজাগ দেখি। এও তো ইসলাম আশ্রিত দেশ, কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজের উপরে মোল্লাতন্ত্রের চাপের মতো কোনো প্রতিবন্ধ নেই এখানে। আধুনিক পারস্য প্রগতির পথে যেতে পারল কী করে? "অতীতের আবর্জনামুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানবসম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার লক্ষ্য।" (পৃ. ১১৬)। বুদ্ধির অন্ধত্ব ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠেছে আধুনিক পারস্য।

বইয়ের শেষ প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথের রচনায় আরবি-পারসি শব্দের ব্যবহার। এই প্রবন্ধটিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি খসড়া বলা যায়। কাজটি কখনও মজিরউদ্দীন সম্পূর্ণ করবেন আশা করব।

ডক্টর মুহম্মদ খজিরউদ্দীন মিয়া, রবীন্দ্রচেতনায় মুসলিম সমাজ, চারুচাক।

আজকাল
৯ জুলাই ১৯৯১

অন্য অবনীন্দ্রনাথ

১৩১ পৃষ্ঠার ছোটো এই বইটির মূল অংশে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ : "সময়ভোলা ঘড়ি", "পালা বাঁধেন অবন ঠাকুর", "পাগলামির কারুশিল্প", "চাইবুড়োর জগৎ", "কল্পনার হিস্টিরিয়া"। পরিশিষ্টের মতো দ্বিতীয় অংশটিতে আছে পিকাসো ও সুকুমার রায় প্রসঙ্গে দুটি লেখা : "পিকাসো : তুলি থেকে কলম" এবং "অসম্ভবের ছন্দ"। মূলত বইটি অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই এবং আমাদের অবনীন্দ্র চর্চায় মূল্যবান সংযোজন।

গদ্যেও অবন ঠাকুর ছবিই লিখতেন — প্রমথনাথ বিশী থেকে একাল অবধি বাংলা গদ্যের আলোচনায় এই ধারণাটা বিশদ হয়ে আছে। বাঙালির সাহিত্যরুচি তৈরি হয়ে ওঠে যেসব বই বারবার পড়ে তার মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা,' 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা' থাকেই। তাঁর এই বিখ্যাত বইগুলি ভাষার স্বাদে যে বাংলা ভাষার অন্য লেখকদের লেখা থেকে একেবারেই ভিন্ন, নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেরই বোধে এটা ধরা দেয়। আস্বাদনের সঙ্গে একটু মনন-চিন্তন যুক্ত হতে স্পষ্ট হয়, ছবি আঁকিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রকরণে ছবিই আঁকছেন। এ'র হাতে বাক্যের শব্দপুঞ্জ যতটা খবর দেয়, গল্প গাঁথে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করে তোলে দৃশ্য-মালা এবং চরিত্রের সচল ভঙ্গিমা। এ ধারণা ভুল নয় কিছু। বরং বলাই যায়, সাহিত্যের এলাকায় এই গদ্যরূপের সৃজন তাঁর প্রধান কীর্তি। কিন্তু রঙ-তুলির বাক্সে ডোর বেঁধে তিনি জীবনের এক দীর্ঘ পর্বে একান্তভাবে "বাক্যের সৃষ্টির" বিচিত্র পরীক্ষায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন এবং রচিত হয়ে উঠেছিল পুঁথি-পালা-গদ্য-পদ্যের এক অতি বিচিত্র সম্ভার। সাহিত্যের এলাকায় এই আর-এক অবনীন্দ্রনাথ, যাঁর সঙ্গে চিত্ররূপময় গদ্য লিখিয়ে প্রসিদ্ধ অবনীন্দ্রনাথের কোনো মিলই নেই যেন। তাঁর প্রতিভা বিকিরণের এ দিকটি নিয়ে তেমন কোনো বিচার বিবেচনা হয়নি এর আগে। অবনীন্দ্রনাথের পুঁথি-পালা ধাঁচের লেখা বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে মনে হতে পারে উৎকেন্দ্রিক কাল্পনিকতার খেলা মাত্র। গৌণ কোনো ব্যক্তিত্বের এমন খেয়ালের খেলা গ্রাহ্য না করলেও চলে। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথের পরেই অসংশয়িত জায়গা যাঁর — এত বড়ো প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব কোন্ ভেতরকার গরজে সৃষ্টির বাঁধা পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন, কেন মুক্তি খোঁজেন কুটুম-কাটাম পুতুল গড়ায় বা আজগবি রচনায়, বুঝে নেবার দায়িত্ব আছে আমাদের।

অবনীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকীর (১৯৭১) সময় থেকে শঙ্খ ঘোষ বছর দশেক নিবিষ্ট আগ্রহে অবনীন্দ্রনাথের পুঁথি-পালা-কল্পকথার জগৎটি নিয়ে কাজ করেছেন —যার ফল এ বইয়ের পাঁচটি প্রবন্ধ। সমকালীন রীতিবদ্ধ সাহিত্যের প্রকাশ-

রূপ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, বিষয়-ভাবনায় দাঁড়িয়ে যাওয়া প্রথার বাইরে যাবার ব্যাকুলতা, এমন কী সেই সময়ের ঘনিয়ে আসা সভ্যতার সংকটের চাপ অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেছে সাহিত্যের ভব্য রীতির বিপরীতে — আজগবি লেখাগুলির ভেতর থেকেই শঙ্খ এসব সিদ্ধান্তের সমর্থন-সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। প্রবন্ধ কটি পড়তে পড়তে অবনীন্দ্রনাথের যে মূর্তি মনে জেগে ওঠে, তাকে একভাবে বলা যায় একজন প্রতিবাদী মানুষ, ভব্য সাহিত্যের এলাকার বাইরে খুব তাৎপর্যময় পরীক্ষায় লিপ্ত। খুবই নিঃসঙ্গ তিনি এই মগ্ন পরীক্ষায়, কিছুটা বা বিষন্ন। অবশ্য এ পরীক্ষা শিল্পগতভাবে নির্দিষ্ট কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে কিনা, কী দাঁড়াচ্ছে ফলাফল, সে বিষয়ে তিনি যেন একান্তই উদাসীন। অনেকটা শক্তি এবং সময় ব্যয় করছেন যে কাজে, যা তাঁর দীর্ঘ অনুধ্যানের বিষয়, সেই কাজকে শ্রীময় সামগ্রিকতায় গুছিয়ে তোলার দিকে তেমন দৃষ্টি বা আগ্রহ ছিল না যেন। ফলে মনে হয়, এইসব লেখায় যতটা খেয়ালের খেলা আছে, সংকল্পের বাঁধুনি এবং জোর নেই ততটা। শঙ্খ দেখিয়েছেন, পুথি-পালা-কল্পকথার মধ্যে নাট্যরূপ, সাহিত্যরূপ, ভাষার ছাঁদ এবং বাংলা শব্দমালার ধ্বনিগত সামর্থ্যের দিক থেকে নানান্ সম্ভাবনার ইঙ্গিত তবুও প্রস্ফুট হয়ে আছে। বাংলা ভাষার নিহিত প্রতিভা উন্মোচনের তাৎপর্যময় নানা সম্ভাবনা অবনীন্দ্রনাথ ধরতে পারছিলেন এবং পারছিলেন বলেই মেতে থাকতে পারতেন তাঁর এই আজগবি সৃষ্টির জগতে।

সাহিত্যে এবং ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয় সৃষ্টির ধারা শুরু হয়েছিল একই সময়ে। ১৮৯৫-এ 'শকুন্তলা' বেরোয়, 'ক্ষীরের পুতুল' তার পরের বছরে। পাশাপাশি আঁকা চলছিল তখন কৃষ্ণলীলা চিত্রমালা। ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের সূচনা হল এই ছবিতে। এর পর থেকে সাহিত্য এবং ছবির দুই সমান্তরাল ধারায় অবনীন্দ্রনাথের আত্মবিকাশ অবিচ্ছেদে এগিয়েছে ১৯৩০ পর্যন্ত, তাঁর ৬০ বছর বয়স অবধি। দীর্ঘ এই ৩৫ বছরে তাঁর নিজের কাজে এবং ছাত্র-শিষ্যদের কাজে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের বনিয়াদ তৈরি হয়ে উঠল। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠানে এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দার শিল্পী সমাবেশে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত গুরুর ভূমিকায়। তাঁর ছাত্ররাই ভারতের বিভিন্ন কলাকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে গেছেন। ভারতশিল্পে নবীন প্রণোদনার সেই প্রথম যুগটি অবনীন্দ্র-যুগ নিঃসন্দেহে এবং অবনীন্দ্রনাথের গুরুর আসনটি ক্রমে বাংলার সীমা পেরিয়ে সারা ভারতে ভিত্তি পেয়েছিল। এই শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পাশে, তুলনায়, তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে একটু খাটোই দেখায়। যদিও তাঁর রচনাপঞ্জী উল্টে গেলে যে-কেউ অনুভব করবেন এ ৩৫ বছরে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। সমকালীন সবকটি প্রধান সাহিত্য পত্রিকায়

তিনি লিখতেন। ছোটোদের জন্য যেমন প্রচুর লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন ছোটোগল্প এবং শিল্পসাহিত্য বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ। পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সংখ্যা প্রায় আড়াইশো, এর বেশির ভাগ কোনো বইয়ে সংকলিত হয়নি। বাক্যের সৃষ্টি এবং রেখা-রঙের সৃষ্টি — দুই ধারাতেই তাঁর পারঙ্গমতা এবং প্রতিষ্ঠা যখন অবিসংবাদিত সেই সময়ে তিনি ছবির মাধ্যমটি হঠাৎ একেবারেই বর্জন করলেন। ১৯৩০ থেকে ৮/৯ বছর আঁকেনইনি কিছু। মুখে তিনি এর কারণ যাই বলুন, সেই সময়ে আমাদের চিত্রকলার এলাকায় যে নতুন হাওয়া উঠছিল, যে হাওয়া প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই প্রবল হচ্ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে অবনীন্দ্রনাথের স্তব্ধতাকে। ছবিতে আমাদের আর এক জাগরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম জাগরণের নেতা এবং গুরু অবনীন্দ্রনাথ যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যই সরে গেলেন ছবির এলাকা থেকে। প্রসঙ্গটি শঙ্খ প্রথম প্রবন্ধে ১৭-২১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। ছবির দিক থেকে শুধু স্মরণীয়, এর পরে ১৯৩৮/৩৯-এ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রী-প্রতিভার এক বিস্ফোরণ ঘটল কবিকংকন চণ্ডী আর কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবিতে। এই শেষ পর্বের কাজে তিনি তাঁরই প্রভাবে এবং অনুকরণে গড়ে ওঠা সমস্ত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন।

ছবির এলাকা থেকে সরে এসে একান্তভাবে লেখায় নিবিষ্ট হলেন ঠিকই, কিন্তু এই পর্বের লেখার সঙ্গে তাঁর আযৌবন লেখার ধারাবাহিক যোগও ছিন্ন হয়ে গেল যেন। ১৯৩০/৩১ থেকে তাঁর রচনাপঞ্জিতে নন্দন-ভাবনা বা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের গতিবিধি নিয়ে প্রবন্ধের সংখ্যা কম, কমে এসেছে বয়স্কপাঠ্য গল্প। পত্র-পত্রিকার দাবি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সাড়া ছিলনা তাঁর দিক থেকে। কারণ সাহিত্যেরও এত দিনের অভ্যস্ত রীতিনীতি আর তাঁকে টানছিল না। শিল্পী বা লেখক আঁকেন, লেখেন পরিশীলিত দর্শক বা পাঠককে মনে রেখে। আঁকায় বা লেখায় সৃষ্টির শিল্পগত যুক্তিক্রম মেনে কাজ করতেই হয়। অবনীন্দ্রনাথ এই পরিশীলিত ভবা স্তরটা সম্পর্কেই যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন ভেতরে ভেতরে। অবনীন্দ্রনাথের মানসিকতা ভালো বোঝা যায় এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর এবং তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ায়। বোঝাবার জন্য শঙ্খ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য ব্যবহার করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন প্রবোধেন্দুনাথকে, "ছেলেগুলোর মাথা মুড়োতে রবিকাকার হাত একেবারে ক্ষুরসিদ্ধ। আমাকেও একদিন বলেছিলেন, অবন, বেশ ছবি আঁকছিলে, আবার কলম ধরেছ কেন? লেখাটেখাগুলো ছাড়ো।" (পৃ. ৮৮)। "বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প" বলে তারিফ করলেও অবনীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর যাত্রাপালা শুনে কোনো মন্তব্য না করেই উঠে যেতেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষমতা এবং সময়ের অপচয় করছেন অবনীন্দ্রনাথ — এ রকমই ভাবতেন কবি। অবনীন্দ্রনাথ এটা বুঝতেন না তা নয়। সচেতনভাবেই তিনি সরে যাচ্ছিলেন শিষ্ট সাহিত্যরুচির এলাকা থেকে, যে এলাকাটা

একান্তভাবে রবীন্দ্র-শাসিত তখন। শঙ্খ যথার্থভাবে দেখিয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথ শেষ পর্বের গদ্য লেখায় এবং পুথি-পালায় সাজানো গোছানো সুভদ্র জীবনের নিচের আর একটি বর্গের মানুষজন এবং সেই পরিবেশের সমগ্রতা তুলে এনেছেন। সঙ্গে এসেছে সেই জগতের ভাষাভঙ্গি। তাঁর স্বতন্ত্র দেখার দৃষ্টিতে জোড়াসাঁকোর পটভূমিতেও চোখে পড়ত "মানুষ. মুরগি, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরুমেথর, নন্দ ফরাশ, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমস্তা, মুহুরি, চৌকিদার, ডাকপেয়াদা" — এই এক অ-বিশিষ্ট জীবনখণ্ড। চলাচলের, বাচনের ভাব-ভঙ্গি সমেত এইসব চরিত্রই আসে 'বাদশাহী গল্প' বা 'চটজলদি' কবিতায়। "চাকর মনিব প্রেথোক প্রেথোক" থাকার প্রথাটা ভেঙে দেন এখানে। আর তাই, "ভাষার ধরনেও বদল হয়ে যায় অনেক। ভাষাতে অন্তত চাকর-মনিব পৃথক পৃথক রাখতে চান না আর অবনীন্দ্রনাথ। অনায়াসে তাই এখানে চলে আসে হিন্দি বা উর্দু বা ওড়িয়া নানা বাক্যবন্ধ, কিংবা নিছক বাংলাতেও এসে যায় প্রাকৃত শব্দের মিছিল · "। (পৃ. ২৯)। তাঁর জীবনের শেষ ২৫ বছরের লেখায় সাহিত্য-বুদ্ধি ও ভাষা-শিল্পের দিক থেকে ক্রমাগত দেখা দিয়েছে 'একটা পালটা ধাক্কা, যেন ভাষার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে আসছে কোনো প্রতিভাষা। যে কথকতার ভঙ্গিকে বলা হয়েছে তাঁর গদ্যের অনাত্ম গুণ, সেইটেই এখন আসছে এমন একটা অর্থপারম্পর্যহীন স্রোতের মতো যে গোটা ব্যাপারটা হয়ে উঠছে কেবল কথার কৌতুক, শব্দ থেকে শব্দে সরে যাবার মজা।" (পৃ. ৮২)। এই যে মজাটা সৃষ্টি করছেন — এর মধ্যে কাজ করেছে একটা সচেতন অভিপ্রায়। একে শঙ্খ বলেছেন, "রাবীন্দ্রিকতার প্রতিস্পর্ধী এক শৈলী।" (পৃ. ৮৮)। শিষ্ট সাহিত্যের যাবতীয় বাঁধা রীতির বাইরে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে আমাদের সমাজ-সংসারের নিম্নস্তর স্তরটিকে স্পর্শ করতে চাইছিলেন, তাঁর বিষয়-ভাবনা, চরিত্র-ভাবনায় তেমন লক্ষণই স্পষ্ট। কিন্তু এটাও ঠিক যে কখনওই তিনি সাহিত্যের এই ভিন্ন আদর্শটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন নি। ফলে, ঠিকই বলেন শঙ্খ, "তাঁর এই লেখাগুলি মাটির খানিকটা কাছাকাছি এসেও যেন ঝুলে আছে শূন্যে।" (পৃ. ৯৫)।

১৯৩০ বা তার কিছু আগে থেকেই ভারতবর্ষের এবং গোটা পৃথিবীরই ইতিহাসে প্রবল ভাঙাচোরা চলছিল। সেই আলোড়িত বাস্তবের প্রভাব সাহিত্যে বর্তানো অনিবার্য ছিল। আমাদের সাহিত্যে বাস্তব জীবনদৃষ্টির তীব্রতা প্রসঙ্গে অনিবার্যত মনে আসে শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকের নাম — যাঁরা নতুন জমি তৈরি করছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বোধের রূপান্তরের কথায় শঙ্খ বলেন, তখন "এক যুগ ভেঙে চলে আসছে আরেক যুগের মধ্যে, চারপাশে শোনা যাচ্ছে চুরমার হবার শব্দ।" (পৃ. ৯৫)। তখনই প্রত্যাশা জাগে এই সূত্রেই

অবনীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে সমকালীন এই তরুণতর লেখকদের চেষ্টার এবং সফলতার তুলনা এসে যাবেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গ শঙ্খ একেবারেই এড়িয়ে গেলেন কেন? অথচ বিশেষ করে "পাগলামির কারুশিল্প" প্রবন্ধটিতে "খুদ্দুর যাত্রা" পাণ্ডুলিপির পরিচয় দিতে গিয়ে আজগবি সেই জগতের মধ্যে উদাত্ত "সামাজিক ইঙ্গিত"-গুলি বারবারই ধরিয়ে তো দিয়েছেন। যাত্রাপালার এই খাতাখানি অবনীন্দ্রনাথ ইলাস্ট্রেট করেছিলেন বিচিত্র উপায়ে। সিনেমার হ্যান্ডবিল, সিগারেট প্যাকেট, পত্রিকার পাতা, গয়নার ডিজাইন — এইসব কেটে কেটে সেঁটে দিয়েছেন। এই অনন্য ইলাস্ট্রেশনে মজা আছে অনেক। শূর্পনখার নাক কাটার প্রসঙ্গের পাশে রেখেছেন "স্নো-ক্রিমের লাল-রঙা এক বিজ্ঞাপন, যেখানে আয়নার সামনে কৌটো হাতে নিকট এক মূর্তি ভাবছে; চুরি করে মাখতে ইচ্ছে যায়।" (পৃ, ৫৫)। চেড়ীদের প্রসঙ্গের জায়গায় পাল্লার মতো করে কাগজ সেঁটে তার উপর লেখা Behind Closed Doors...Because...। "আর সেই পাল্লা খুললেই দেখা যায় স্বল্পবাসা কয়েকটি বিদেশিনী নর্তকীর ছবি।" (পৃ, ৫৬)। এসবেরই মধ্যে রাবণের যুদ্ধ প্রসঙ্গে এসে যায় স্বস্তিকা চিহ্ন এবং পশ্চিমি সৈনাদের কুচকাওয়াজের ছবি কিংবা রাবণের যুদ্ধ হুংকারের পাশেই এঁটে দেন জর্মান সেনানায়কের ছবি। শঙ্খর অবলোকন, "কেবল মজাই নয়, এর মধ্যে কাজ করছে পরোক্ষ একটা সমালোচনারও মন, দেশবিদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের প্রতিও তাঁর কোনো কোনো কটাক্ষপাত।" (পৃ. ৬২)। এবং বিচিত্র বিজ্ঞাপন যা আহরণ ও ব্যবহার করেছেন এই খাতাটিতে তার থেকে স্পষ্ট হয় কেমন ভাবে, "একটা ভোগী এবং বাণিজ্যিক সমাজ তৈরি হয়ে উঠছে অবনীন্দ্রনাথের চোখের সামনে...।" (পৃ. ৬৩)।

এইসব এবং এমনই অনেক বাস্তব উদ্দীপনা রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গদ্য ও পুঁথিপালায়, যার ভিন্নতর সাহিত্যগত চরিতার্থতা দেখতে পাই তখনকার নতুন প্রজন্মের লেখকদের কাজে। তুলনায় অবনীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ রয়ে গেছে অনেকটাই শূন্যচারী, শিল্পিত বাস্তবের চরিতার্থতা উপার্জনে যেন উদাসীন রয়ে গেছেন তিনি। সৃজনমুখী কল্পনার অন্তর্গত নিয়ম-সংযমে আর বাঁধতে চাননি নিজেকে, কাল্পনিকতার উধাও হাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরই সৃষ্টি গল্প বলিয়ে চাইদাদার মতো তাঁরও কল্পনার যেন হিস্টিরিয়া হয়েছে।

আধুনিক ভদ্রলোকের সংস্কৃতির বৃত্তের বাইরে যাবার ব্যাকুলতাতেই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথ নাটকেরও যথার্থ লোকায়ত রূপ উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। নিরন্তর যাত্রাপালা লিখে যাওয়ার মধ্যে এই একটা ইতিবাচক গরজ নিশ্চয়ই কাজ করেছে। "পালা বাঁধেন অবন ঠাকুর" প্রবন্ধে আবদ্ধ মঞ্চের অভিনয় কলা এবং মুক্তমঞ্চের পরীক্ষার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা ও কাজের বিস্তৃত আলোচনা আছে। অনেক তত্ত্বগত আলোচনা এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা

রয়েছে আমাদের সামনে। তবুও কার্যত মানতে হয় থিয়েটার এবং যাত্রা (থিয়েটারি কায়দায় আক্রান্ত এখনকার যাত্রা নয়) দুই ভিন্ন ফর্ম। একটা আর-একটায় মিলে যাবে — এবোধ হয় হবেনা কখনও। ব্রেশ্‌ট চর্চায় যে দর্শকেরও অংশগ্রহণের ধারণা এল, তাকেও কোনো ভাবেই যাত্রার আবেগে উদ্বেল অভিনয়ের রীতির সঙ্গে মেলানো যায়না। অবনীন্দ্রনাথ বলেন, "থিয়েটার জিনিসটা আমাদের নিজস্ব নয়। ...কাজেই রঙ্গমঞ্চে রঙ্গালয়ে যে দূষিত হাওয়া, তার থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।" থিয়েটারে যা কাজ হয়েছে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত তার মূল্য এভাবে উড়িয়ে দেবার কোনো মানে নেই। শঙ্খ মন্তব্য করেছেন, "অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি, খুঁজছিলেন আকাশের এই নীল চাঁদোয়ার নিচে ফিরে আসার পথ। আর্টিফিশিয়াল স্টেজকে ওঁরা ভেঙে আনতে চাইছিলেন আমাদের প্রবহমান যাত্রার মুক্ত অঙ্গনে।" (পৃ. ৩৫)। কোনো একটা ফর্ম আশ্রয় করলেই তার বন্ধন এবং সে বাধা পেরোবার চেষ্টা শিল্পী মাত্রেরই কাজে এক দ্বন্দ্ব-উত্তরণময় সচলতা আনে। এতে ফর্মটিরই নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হয় — যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকে। কিন্তু, শঙ্খর এই লেখা এবং রবীন্দ্রনাট্য বিষয়ে তাঁর অন্য প্রসিদ্ধ লেখাগুলি মনে রেখেই বলব, প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের নাটক যা দাঁড়ায় সে থিয়েটারই, যাত্রা নয় কখনও। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য সরাসরি থিয়েটারকে প্রত্যাখ্যানই করেন। সব দেশেই নাটকের আদিতম রূপ পাওয়া যায় কৃষি-রিচুয়াল সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানে, যেটা আমাদের দেশে ব্রত অনুষ্ঠানে এখনও দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ এই আদি নাট্যরূপ বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন 'বাংলার ব্রত' বইয়ে। শঙ্খ অবনীন্দ্রনাথের এই বোধ কীভাবে তাঁর যাত্রাপালায় ফিরে এসেছে — চমৎকার দেখিয়েছেন। ব্রতের মতোই একটা খোলামেলা, অংশ নিচ্ছে যারা — সকলের সংকল্প-কামনার একতায় নিবিড় কোনো নাট্যরূপে পৌঁছনো অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু পৌঁছন নি তেমন কোনো সিদ্ধিতে, একালে বসে সেই ফর্মের শুদ্ধতা আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় বলেই পারেন নি পৌঁছুতে। বদলে তাকে আরও বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা-পরম্পরা মিলিয়ে নিয়ে, রামায়ণ-কথামালা-হিতোপদেশ এমন কী 'লম্বকর্ণ' (পরশুরাম রচিত) পর্যন্ত মিলিয়ে মিশিয়ে এক উতরোল রঙ্গলোক তৈরি করতে হয়। মূল গল্পগুলি থেকে পালায় পৌঁছবার অসুবিধে এড়ানোর জন্যই অবনীন্দ্রনাথ মধ্যবর্তী একটা স্তর হিশেবে কথকতার পুঁথির ফর্মটি নিতেন — শঙ্খর এই সিদ্ধান্ত এসেছে অবনীন্দ্র-নাথের লেখা অনুপুঙ্খ নজর করে পড়ার ফলে। মূল রচনার ভেতর থেকে প্রতিপাদ্যের সমর্থক তথ্য তুলে আনার এই ধরনটি শঙ্খর বক্তব্য অব্যর্থ করে তোলে। এইটি তাঁর লেখার বড়ো গুণ। কিন্তু পুঁথি থেকে যাত্রাপালায় রূপান্তর করে অবনীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করেন সেই বস্তুটিকে কি আমাদের প্রথাগত যাত্রার পালার সঙ্গে ঠিক মেলানো যায়? শঙ্খ দেখিয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথের

পালাগুলি আধুনিক জীবনের কোনো উপলব্ধিকে অন্তঃসার করে নিতে পারেনা শেষ অবধি। কথাটা ঠিক। তাঁর পালাগুলি শুধু "হিশেবি জীবনের বাইরে বেরিয়ে নিঃশ্বাস নেবার অল্প অবসর" দেয়। কিন্তু এইসব পালায় সাধু এবং নাগরিক সাহিত্যের বাইরে "আরেকটা সমান্তরাল গ্রামীণ ধরনের সম্ভাবনা" কি সত্যিই ছিল যেমন শঙ্খ ভাবছেন প্রবন্ধটির শেষ বাক্যে? লোকায়তে যাবার যত আকুলতা থাক অবনীন্দ্রনাথে, তাঁর যাত্রাপালার রঙ্গকৌতুক উপভোগের জন্য দরকার হয় কর্ষিত নাগরিক রসবোধ। অবনীন্দ্রনাথের হাতে যাত্রাপালার ফর্ম একটা বিশিষ্ট চেহারা পেল, তবে সে আর গ্রামীণ যাত্রা রইল না। লৌকিক ফর্মের এই রূপান্তর আমাদের ভদ্রলোকের সাহিত্যের এলাকার জিনিশই দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত।

সমকালীন সভ্যতার সংকট অবনীন্দ্রনাথের রঙ্গকৌতুকের জগতে ছায়া ফেলেছে কখনও কখনও, এই প্রসঙ্গে, "কল্পনার হিস্টিরিয়া" প্রবন্ধে পিকাসোর *Desire Caught by the Tail* এবং *The Four Little Girls* নাটকদুটির তুলনা এসেছিল। "পিকাসো : তুলি থেকে কলম" প্রবন্ধে শঙ্খ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অবরুদ্ধ প্যারির অভিজ্ঞতায় স্তম্ভিত পিকাসোর কলমের সৃষ্টি *Desire* এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিতে লেখা দ্বিতীয় নাটকটির "উদ্ভট কিন্তু তাৎপর্যময়" পরিমণ্ডল বিশ্লেষণ করেছেন। এ বইয়ের শেষ প্রবন্ধ "অসম্ভবের ছন্দ"। সুকুমার রায়ের খেয়াল খেলার উদ্ভট জগতে মিলে আছে শুদ্ধ কবিত্বের উপলব্ধি। এই অনন্য সৃষ্টির অন্তঃসার উন্মোচন প্রসঙ্গে শঙ্খ দেখিয়েছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথকে সুকুমার রায় প্রভাবিত করেছেন। দেখিয়েছেন, প্রখর "পরিমাণ সামঞ্জস্যের" বোধ সুকুমার রায়ের লেখায় যেমন অনেকগুলি মাত্রা অনায়াস সৌষম্যে মেলায়, রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের খেয়াল রসের লেখা সে চরিতার্থতায় পৌঁছয় না।

গত ২৫/৩০ বছরে বাংলা গদ্যের যেন একটা সর্বজনীন শৈলী দাঁড়িয়ে গেছে। কারও লেখাই আর আলাদা করে চিনে ওঠা যায়না। শঙ্খর আরও এই একটি সদ্য বই নতুন করে পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়েছে, আমাদের সময়ে তিনি গদ্য লিখলেন একেবারেই নিজের মতো। যে বিষয়েই লিখুন-না-কেন, শঙ্খ নিজেরই নিটোল উপলব্ধি উন্মোচন করেন। যুক্তির জোড়গুলো আড়ালে রাখেন। শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়েই কথা বলেন, কিন্তু বলেন বিনত মন্ময় ভঙ্গিতে। অন্তরঙ্গ আলাপনের উত্তাপময় বাক্যগুলি তাঁর উপলব্ধি বিকিরণ করে পাঠকের বোধচৈতন্যে।

শঙ্খ ঘোষ, কল্পনার হিস্টিরিয়া প্রথা (১৯৯৪)।

আজকাল
১৭ জুলাই ১৯৮৪

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিকল্প শিক্ষাতন্ত্রের সন্ধান

ডেভিড হেয়ার পাল্কিতে চলেছেন। তাঁর পাল্কির পাশে পাশে ছুটছে এক ঝাঁক ১২/১৩ বছর বয়সি বালক। মুখে তাদের অভিভাবকদের শেখানো আকুল প্রার্থনা—"me poor boy, have pity on me, me take in your school." ১৮২৫/২৬ সালের কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' বইয়ে এই দৃশ্যের বর্ণনা পাই। সে বালক দলের মধ্যে প্রথম যুগে ইংরেজি শেখা মনীষী রামতনু লাহিড়ীও ছিলেন। ইংরেজি বিদ্যা ছাড়া ইংরেজ জমানায় বৈষয়িক সফলতা সম্ভব নয়, শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অগত্যা বিদ্যাদাতা হেয়ার সাহেবের পাল্কির সঙ্গে দৌড়তে হয় রামতনু লাহিড়ীদের। রামতনু নাকি দুমাস এমনি দৌড়ে দৌড়ে হেয়ার সাহেবের স্কুলে জায়গা পেয়েছিলেন।

ঘটনাটি, আজ মনে হয়, বাংলার একটা যুগের মানসিকতার প্রতীক। অশেষ তাৎপর্যময় প্রতীক। বাংলা পাঠশালা, মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠী নিয়ে দেশি শিক্ষার একটা আবহমান বিন্যাস ছিল। তখনও টিঁকে ছিল সে বিন্যাস। কিন্তু বাবু-ভদ্রজনের মধ্যে সেই শিক্ষার দিকে টান ক্রমেই কমে এল। য়ুরোপের দেশে দেশে আবহমান শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আধুনিক করা হয়েছে। প্রাচ্যে জাপান একইভাবে নিজের ভাষার আধারে দেশের মানুষের কাছে আধুনিক বিদ্যা পৌঁছে দিল। সে সুস্থ স্বাভাবিক আধুনিক বিকাশের, উত্তরণের ভাবনা আমাদের চেতনায় এসেছে অনেক পরে। ইংরেজ সংস্রবের প্রথম যুগে আমাদের সমাজ-নায়ক মনীষী ব্যক্তিরাও ইংরেজি ছাড়া মুক্তি নেই ভাবতেন। বৃটিশ নীতির সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত, রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে ১৮২৩ সালে বড়োলাট আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে মেধাবী য়ুরোপীয় শিক্ষকদের দিয়ে গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর সংস্থান বিদ্যার মতো দরকারি বিষয় শেখাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ, এইসব বিদ্যার উন্নত মানের জন্যই বিশ্বের অন্য অংশের মানুষের চেয়ে য়ুরোপীয় জাতিগুলি অনেক উন্নত হয়ে উঠতে পেরেছে। রামমোহনের এই প্রার্থনা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টিপ্পনী করেছেন, "লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পত্রে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন।" ('রামমোহন রায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪)। কথাটা আদৌ ঠিক নয়। চিঠিতে দুবার বলা আছে "employing

European gentleman of talents and education..." এবং "by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe." য়ুরোপীয় শিক্ষকদের পক্ষে ইংরেজি ছাড়া কোনো দেশি ভাষায় পড়াবার সম্ভাবনা ছিলনা নিশ্চয়।

ভারতবর্ষ ইতিহাসের আধুনিক পর্বে উত্তীর্ণ হবে ইংরেজ শিক্ষকের এবং ইংরেজি-মাধ্যমের শিক্ষায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমরা এই ভাবনামন্ত্র লালন করে এসেছি — এ সত্য মানতেই হয়।

অন্য দিকে বৃটিশ প্রশাসনেরও এদেশে ইংরেজি বিদ্যা চালানোর গরজ বাড়ছিল। প্রশাসনে লোক চাই। গোটা ইংলণ্ডের লোক ভারতে তুলে আনলেও ভারত-শাসনের অন্তহীন সমস্যার সুরাহা হয়না, এটা কর্তারা মর্মে মর্মে বুঝছিলেন। শাসনযন্ত্রটি মসৃণভাবে চালাবার জন্যে এদেশেই লোক তৈরি করা ভিন্ন উপায় ছিলনা। ভারতীয় সমস্ত প্রজা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে — এমন কোনো দায় কেউ বোধ করেনি। কথাটা খোলাখুলি বলেছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay, ১৮০০-৫৯)। তাঁর মন্তব্য, এখন এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে খুব চেষ্টা করা উচিত যারা আমাদের এবং আমরা যাদের শাসন করি সেই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে দোভাষির ভূমিকা নেবে; সে হবে এমন এক শ্রেণীর মানুষ যারা রক্তে, গায়ের রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, কথায় এবং মেধায় ইংরেজ। (Macaulay's Minutes, 2nd Feb. 1835)। ১৮৩৫ সালে মেকলের এই নীতিই সরকারি নীতি হয়ে দাঁড়াল। দুই বড়ো লাট, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং তাঁর পরে লর্ড অক্ল্যান্ড ১৮৩৫ থেকে ৪২-এর মধ্যে মেকলের শিক্ষানীতি এদেশে প্রয়োগ করলেন। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে য়ুরোপীয় আধুনিক জ্ঞান দেওয়া হবে কিছু সংখ্যক মানুষকে — শিক্ষাখাতে ধরা অর্থ এই পরিকল্পনায় খরচ করা হবে স্থির হয়ে গেল।

বিত্তবান এবং নতুন শহুরে মধ্যবিত্ত ভদ্রজনেরা বৈষয়িক সফলতার স্বার্থে ইংরেজি বিদ্যা চাইছিলেন, অন্য দিকে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় শৃঙ্খলা আনার গরজে দেশি সহযোগী শ্রেণী গড়ার জন্য ইংরেজ কর্তারা ইংরেজি শিক্ষা চালাতে চাইছিলেন। দুই পক্ষের উদ্দেশ্যের মিল তাই অনায়াসেই হল। বাধা দেবার প্রশ্নই ওঠেনি তখন। কেউ ভেবেও দেখেন নি, আবহমান দেশি শিক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাসটিকে রূপান্তরিত করা সম্ভব কিনা। এ বিষয়ে তথ্য অজানা ছিল — এমন নয়। ১৮৩৫-৩৮ সালের মধ্যে উইলিয়ম অ্যাডাম (William Adam) দেশি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনটি প্রতিবেদনে অ্যাডাম তাঁর অনুসন্ধানের ফল সরকারে পেশ করেছিলেন। দেখিয়ে-ছিলেন — বহুকালের বাংলা পাঠশালার শিক্ষায় দেশের রায়ত, নিম্নবিত্ত মানুষ, দোকানি — এঁরা বৈষয়িক কাজ চালাবার মতো জ্ঞান পেয়ে আসছেন। অ্যাডামের

পরামর্শ ছিল — ইংরেজিকে শিক্ষার একমাত্র বাহন না করে দেশের লোকের মাতৃভাষায় নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যবস্থাও পাশাপাশি রাখা উচিত। দেশি শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার করা উচিত।

এ পরামর্শ ইংরেজ প্রশাসন বা নেতৃস্থানীয় ভারতীয় — কারোরই গ্রাহ্য মনে হয়নি তখন। য়ুরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে যোগ সাধনের একমাত্র উপায় ইংরেজি। জীবনে এবং জীবিকায় প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় ইংরেজি — এইসব যুক্তি ছিল। এ যুক্তি প্রকারান্তরে বশ্যতারও যুক্তি। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব যাদের আয়ত্তে, তাদের বিরুদ্ধে না যাবার যুক্তি। ফলে দেশের মানুষের দিক থেকে শাসকের যুক্তির বিকল্প খোঁজার দায় কেউ বোধ করেন নি। বশ্যতা বোধ এবং সফলতার সদুপায় সম্পর্কে বোধ মিলে মিশে যে মনোভাব দাঁড়িয়েছিল তাতে ঔপনিবেশিকদের নীতিই একমাত্র মান্য নীতি দাঁড়িয়ে গেল। শাসকের নীতির সঙ্গে সহযোগিতায় এগিয়েছিলেন সমকালীন বিত্তবান্-উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষেরা। মেকলে বুঝিয়েছিলেন, সমাজের উঁচু তলার মানুষদের জন্য য়ুরোপীয় আধুনিক শিক্ষার আয়োজন হলেই চলবে। উঁচু তলার মানুষের মাধ্যমে সে শিক্ষার সুফল সাধারণের মধ্যে চুইয়ে চারিয়ে যাবে। একে বলা হল ফিল্ট্রেশন থিওরি (filtration theory)। ইংরেজ রাজত্বের সুফলে পুষ্ট উঁচু তলার বাবু ভদ্র-সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থেই এ তত্ত্ব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। আরও কিছু পরে, ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন, সরকারি শিক্ষায়তন থেকে পাস করা ইংরেজি জানা ছেলেরাই শুধু সরকারি চাকরি পাবে। ইংরেজি শিক্ষা আঁকড়ে ধরার পক্ষে এ সবচেয়ে বড়ো প্রলোভন। ফলে বাংলা পাঠশালা, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা — শিক্ষার দেশি প্রণালী, দেশি আধার তাৎপর্যহীন, নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে গেল।

শিক্ষার প্রণালী এবং শিক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে তফাত তখন হিশেবে আনা হয়নি। কালের পরিবর্তনে প্রয়োজনের নতুন তাগিদ আসে, নতুন জ্ঞানের বস্তু আহরণ করতেই হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় য়ুরোপের ইতিহাসে প্রগতির মাত্রা যে স্তরে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষেও য়ুরোপীয় বিদ্যার দরকার ছিল। বিদ্যার কোনো জাত নেই। সভ্যতার ইতিহাসে প্রমাণিত, কোনো নতুন জ্ঞানের বিষয় দেশ-বিশেষের, জাত-বিশেষের একচেটিয়া থাকেনি কখনও। য়ুরোপীয় আধুনিক মনের যা-কিছু উদ্ভাবন, তাতে ভারতের, প্রাচ্য দুনিয়ার সকল মানুষের অধিকার অবশ্য মান্য। প্রশ্ন ছিল, কী ভাবে, কোন্ আধারে, কোন্ প্রণালীতে সে জ্ঞান আমরা নেব। কোন্ প্রণালীতে বইয়ে দিলে গোটা দেশের মনন-শরীরে সে জ্ঞান সহজে চারিয়ে যাবে, পুষ্টি যোগাবে। ইংরেজির মাধ্যম মেনে নেওয়ায় শিক্ষার আবহমান দেশি প্রণালীটা বরবাদ করে দেওয়া হল। "শিক্ষিত" শব্দের মানে দাঁড়াল য়ুরোপীয়

আধুনিক জ্ঞান যে ইংরেজি ভাষার আধারে পেয়েছে এমন মানুষ। মেকলের জ্ঞান চুইয়ে নামার তত্ত্ব অনুযায়ী সকলের পক্ষে এ শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। ইংরেজ সরকার এ তত্ত্ব কখনও ছাড়েনি। শিক্ষার এলাকায় যা-কিছু সংস্কার এবং মাজাঘষা এর পরে হয়েছে — সব এই তত্ত্বের সীমার মধ্যে, এর বাইরে কেউ যাননি। ফলে এক প্রজন্মের মধ্যেই দেশের মানুষ সরাসরি দু-ভাগ হয়ে গেল। "শিক্ষিত" এবং "অশিক্ষিত"। ইংরেজি জানা সংকীর্ণ একটি উপর-স্তর এবং ইংরেজি না-জানা বিশাল ভারতীয় লোকসমাজ। দেশের যাবতীয় সংকটের উৎসে আছে এই ভেদ। যাবতীয় তমিস্রার উৎসমুখ। আজও আমরা সেই তিমিরে আচ্ছন্ন।

শিক্ষা সংকটের জট নিয়ে ভাবতে গেলে এই শোচনীয় ইতিহাসের পটে পৌঁছতে হয়।

২

এক প্রজন্মেই ইংরেজি শিক্ষা "শিক্ষিত" শ্রেণীর চেহারা-চরিত্র কেমন বদলে দিয়েছিল তার এক সমীক্ষা মেলে বঙ্কিমচন্দ্রের *The confessions of a Young Bengal* প্রবন্ধে। বলেছিলেন — আমাদের ঘরবাড়িতে আসবাবপত্রে, যানবাহনে, খাদ্য-পানীয়ে, পোশাক-আশাকে, আটপৌরে চিঠিপত্রে, কথাবার্তায় — সর্বত্র দেখি অ্যাংলো-স্যাক্সন ভিনদেশি ছাপ। ·· জাতীয়-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ত্রিস্তর আচ্ছাদনে আবৃত অতি পরিমিত ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজদের দৃষ্টান্ত মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যে বঙ্গীয় সমাজের বহিরঙ্গে এত-সব পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।*

---

* That, in the outward circumstances of social and personal life, English-educated Bengalis are rapidly getting Anglicised, few English-educated Bengalis will deny. The stamp of the Anglo-Saxon foreigner is upon our houses, our furniture, our carriages, our food, our drink, our dress, our very familiar letters and conversation. He who runs may read it on every inch of our outward life....

English education, administered with the most rigid econmy and the example of Englishmen, wrapped up with the threefold covering of national, political and religious exclusiveness have, in a single generation, sufficed to work these changes in the external features of Bengali Society.—"The confession of a Young Bengal" —Jogesh Chandra Bagal ed: Bankim Rachanavali, 1969 p: p. 137-38

এই সমীক্ষায় ঘটে যাওয়া বিপর্যয় এবং ভ্রষ্টতা সম্পর্কে যে সচেতনতার আভাস রয়েছে তারই তীক্ষ্ণতর অভিব্যক্তি মেলে 'বঙ্গদর্শন-এর পত্র সূচনা'-য় এবং 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে। কেন বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করছেন বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি "শিক্ষিত" "অশিক্ষিত" দুই স্তরের মধ্যে সেতুহীন বিচ্ছেদের কথা তুলেছিলেন। "শিক্ষিত" সম্প্রদায় যে বিদ্যাচর্চা থেকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে অবধি ইংরেজি চালান — তার ব্যবহারিক উপযোগিতা যেমনই হোক — ও পথে দেশের উদ্ধার নেই। তাঁর শ্লেষময় ভাষায় বলেছিলেন,

"বাঙ্গালী কখনও ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িবে। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল।"

শুধু উঁচু তলার লোকের জন্য ইংরেজি বিদ্যার ব্যবস্থা সম্পর্কে মেকলের তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র মারাত্মক ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেন,

"যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।"

১৮৭২ সালে ('বঙ্গদর্শন' প্রকাশ) বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যঙ্গময় অবলোকন ১৮৮৮-তে এক মর্মস্পর্শী আর্তিময় ভাষায় আবার উচ্চারিত হয়। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লেখেন,

"কেন যে এ ইংরাজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি — শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল।...রামা এবং রামার গোষ্ঠী — সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ' — তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে — বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"

এ কণ্ঠস্বর আসছে উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে। মেকলের শিক্ষাতত্ত্ব চালানোর প্রায় পাঁচ দশক পরে। এক পুরুষে দেশ দুভাগ হয়ে গেল। ছয় কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শো-র দেশে "শিক্ষিত" বাবু ভদ্রজন "জলের উপরে তেলের মতো" ভাসমান, শিকড়হীন; স্বদেশে পরবাসী। ভ্রান্ত এবং কূট শিক্ষানীতি এদেশে একান্ত প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাকে শিকড় মেলতে দিলনা। ভারতীয় আধুনিকতার যাবতীয় সংকটের মূল এইখানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ এবং কাতর আর্তি একটি বিকল্প তত্ত্ব সামনে নিয়ে এল। শিক্ষার প্রশ্নে বৈষয়িক সফলতার যুক্তি, শাসকের সঙ্গে সহযোগিতার যুক্তি, বশ্যতার যুক্তির কাঠামো ভেঙে যায় এই বিকল্প তত্ত্বের সংঘর্ষে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাতে অবশ্য কিছু হেরফের হয়নি, যেমন চলছিল তেমনি চলেছে, নয়তো — কোথাও কোথাও কিছু গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বশ্যতার যুক্তি ভেঙে যে একটি বিকল্প সামনে এল — আমাদের স্বাদেশিক চেতনার দিক থেকে, দেশকে যথার্থ আলোয় বোঝার দিক থেকে তার মূল্য অপরিসীম। এই ধারায় আমাদের সামনে "স্বাধীন শিক্ষা"-চিন্তার প্রগতির এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

স্মরণ হবে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়েই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কালেজি শিক্ষা' (১৮৮০) প্রবন্ধে পরিষ্কার বলেছিলেন, "আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোনো কাজেরই নহে। যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন, অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই····। বাংলা হইলে এই কেতাবি জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করো, ভালো করিয়াই শিক্ষা করো। ইংরেজিতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কী? বাংলা দিয়া ইংরেজি শিখ না কেন? ইংরেজি দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজি মুখে শিখিতে হয়।"

হরপ্রসাদ ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা এক নতুন জাতিভেদের কথা বললেন

"যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরাজি শিক্ষা অল্প হয়, আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকেনা, শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান।" ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত, পৃ. ৪৭৭-৮৫)।

"শিক্ষিতগণ" নতুন এক জাতি হয়ে দাঁড়ান, "সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস" করেন যেন। মেকলের পরিকল্পনা কেমন অচিরেই ষোল আনা সফল হয়েছিল — এসব উক্তি তা অব্যর্থভাবে দেখিয়ে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে আমাদের স্বদেশ জিজ্ঞাসার একেবারে কেন্দ্রে জায়গা নিয়েছে শিক্ষার প্রশ্ন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাতত্ত্বের বিকল্প নিয়ে এই ভাবনায় আধুনিক শিক্ষার গোটা প্রণালী বর্জনীয় প্রতিপন্ন হয়। আশির দশকেই, ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ লেখেন। শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের অভ্রান্ত যুক্তির উপরে স্বদেশের সংকটের চেহারা তীক্ষ্ণ রেখায় ফুটিয়ে তোলেন এই প্রবন্ধে। দেখান, জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রতি অতি আবশ্যক দুটি শক্তি — চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি — দুটিই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শৈশব থেকে নিধন করা হয়। ইংরেজি ভাষার আধারে, বিলিতি কেতায়, আধুনিক বিদ্যাদানের যে আয়োজন — তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, হতভাগ্য শিশুদের বিদেশি কারাগারে রুদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা। এই তীক্ষ্ণ লেখাটি প্রত্যাশিত সাড়া যে জাগিয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লেখেন,

"প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,

"...প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই।"

আনন্দমোহন বসু লেখেন,

"আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত।...বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।" ('রবীন্দ্র-রচনাবলী', দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬১৬-১৭)।

ইংরেজি শিখলেই চাকরির সুযোগ মিলবে — তেমন সম্ভাবনা ক্রমে গুটিয়ে আসছিল। তবু মধ্য শ্রেণীর মানুষের মোহ সহজে যায়নি। সামনে জীবিকার আর কোনো উপায়ও তো খোলা ছিলনা। তাই "স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি" ওঠা কিছু আশ্চর্যের নয়। সে আপত্তি সত্ত্বেও সচেতন মানুষের কাছে গোটা দেশটাকে যে ভুল পথে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বাস্তব সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিকল্প শিক্ষাতত্ত্বের সন্ধান ক্রমেই তীব্র হয়ে চূড়ান্ত পরিণতি পায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারে। শুধু একটি বিকল্প তত্ত্ব সংগঠন নয়, সে তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণ স্বদেশি আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। শিক্ষাকে শাসকের বশ্যতা এবং শাসকের সঙ্গে

সহযোগিতার উপায় হিসাবে ব্যবহারের বিকল্প—শিক্ষা হবে জাতির স্বাবলম্বনের উপায়। এই বিকল্প তত্ত্বের বাস্তব রূপ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন)। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ১লা মার্চ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ-এর উদ্বোধন হয়। পরিষদের ৪০ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভগিনী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, প্রসন্নকুমার রায়, আশুতোষ চৌধুরী, নীলরতন সরকার।

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ স্থায়ী হয়নি। আমাদের অনেক মহৎ উদ্যোগের মতো এই উদ্যোগটিও স্থায়ী ভিত পায়নি। অরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্সটিটিউট সরকারি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিস্পর্ধী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়েও টিকতে পারল না। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ এর সঙ্গে জড়িত মনীষীদের অভিজ্ঞতায় এই উদ্যোগের মহিমা যেমন এক গৌরবের ছাপ রেখে যায়, এ উদ্যোগের ব্যর্থ পরিণাম তেমনি স্বদেশের সমকালীন বাস্তবতার জটিল স্বরূপ স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখাতেই সে জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সমগ্র অবলোকন ধরা দিয়েছিল।

ইংরেজ গেছে। ইংরেজের উপনিবেশ ভেঙে গেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশের যে সংকট নির্দেশ করেছিলেন আজও তার আসান হয়নি। আজও তাঁর বিশ্লেষণ এবং নির্দেশগুলি তাই প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে।

৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'রামেন্দ্র-রচনাবলী'র চতুর্থ এবং ষষ্ঠ খণ্ডে বিশেষভাবে শিক্ষা বিষয়ে লেখা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ৯টি প্রবন্ধ পাই।

চতুর্থ খণ্ডে : ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম	(১৮৯৫)
শিক্ষাপ্রণালী	(১৮৯৮)
সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার	(১৮৯৯)
অরণ্যে রোদন	(১৯০২)
ষষ্ঠ খণ্ডে : আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ	(১৯০৫)
স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়	(১৯০৫)
ব্যাধি ও প্রতিকার	(১৯০৭)
লোকশিক্ষা	(১৯১০)
যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষা প্রণালী	(১৯১০)

এই সব রচনার সঙ্গে আরও দেখতে হয় স্যাডলার কমিশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রতিবেদন :
Michael Sadler, *Report Of the Calcutta University Commission, 1919 Vol. VII* (Evidence and Documents) pp. 303-09.

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আয়ু-কাল ১৮৬৪-১৯১৯ খৃস্টাব্দ। বরাবর উজ্জ্বল ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে বিজ্ঞান বিষয়ে (Natural and Physical Science) প্রথম হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। জীবিকা নির্বাচনে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিলনা, অন্য প্রলোভন এড়িয়ে শিক্ষকতায় গিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপক হয়ে আসেন। ১৯০৩ সালে অধ্যক্ষ হন এবং মৃত্যু অবধি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন।

এই তথ্যটুকু থেকে দেখা যাচ্ছে রামেন্দ্রসুন্দর ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন এবং সে শিক্ষাব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ একটি ডিগ্রি কলেজ হাতেকলমে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সমকালীন শিক্ষা কাঠামোর একেবারে ভেতরের মানুষ ছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মনন চিন্তন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতানির্ভর। উচ্চশিক্ষার এলাকায় রিপন কলেজের মতো কলেজ তখন সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, খুব সীমাবদ্ধভাবে হলেও এসব কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের পক্ষে নিজেদের বোধবুদ্ধি মতো পরিচালনা অধ্যাপনার স্বাধীন সুযোগ কিছুটা ছিল। কিন্তু সিলেবাস, পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং উচ্চ শিক্ষার যাবতীয় বিধিব্যবস্থার দিক থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বাইরে যাবার সাধ্য ছিলনা। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-কাঠামোর সীমার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে সারাজীবন কাজ করতে হয়েছে। পরাধীন শিক্ষা-কাঠামোর ভেতরের ফন্দি-ফিকির, কারচুপি হাতেকলমে কাজের অভিজ্ঞতায় তাঁর বোধে স্বচ্ছ হয়ে উঠত। দেশকালের বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন এবং সংবেদনশীল মানুষ রামেন্দ্রসুন্দরের মনন-জীবনে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক। সে প্রতিক্রিয়া তাঁকে শিক্ষার প্রশ্নের বাইরে বড়ো বাস্তবের পটে নিয়ে যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের মূল দ্বন্দ্ব — ভারতীয় জনগণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে নির্ভুল চেতনার নজির আছে তাঁর রচনায়। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার সংকট যে কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, ঔপনিবেশিক শাসনের গোটা বিধি ব্যবস্থার অঙ্গ — বিশদভাবে রামেন্দ্রসুন্দর এই বিশ্লেষণ দেশের মানুষের সামনে রাখেন। তাঁর সেই বিশ্লেষণের কিছু নজির এখানে তুলব :

"আমি রাজনীতির সম্পর্ক একেবারে বর্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রবলের সাহায্যে যে দুর্বল মুখে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ? আমাদের দয়াময়ী ধাত্রী গভর্ণমেণ্ট জননী আমাদিগকে যে স্তন্যপীযূষদানে অহরহ তৃপ্ত রাখিয়াছেন, এবং ঘুম-পাড়ানিয়া গান অবিরত কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়া আরামের পালঙ্কে আমাদের ঘুম পাড়াইতেছেন, আমাদের এই পীযূষ পানের ও সুখনিদ্রার ও স্বপ্ন-দর্শনের স্বাতন্ত্র্যের দৌড় কতটুকু ?

"আমাদের অবস্থা কতকটা হট্ হাউসের যত্ন পালিত চারার মত। আমরা যথাসময়ে জল পাই, আলো পাই, শীতাতপ উপভোগ করি, আমাদের কীটের ভয় নাই, শিশিরের ভয় নাই, বড় বড় মহীরুহ যখন প্রভঞ্জনের সহিত মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভূমিশায়ী হয়, আমরা তখন গ্লাসকেসের ভিতর হইতে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া থাকি ; কিন্তু হায় ! দৈব বিধানে আমাদের প্রভুর যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ শিথিল হয়, যদি আমাদের মালী মহাশয় একদিন আমাদিগকে জল যোগাইতে ভুলিয়া যান, তবে সংসারের নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্দ্বে আমাদের ঔদ্ভিদিক জীবনের পরমায়ু কতটুকু হইয়া দাঁড়ায় ?

"আমাদের এই হট্‌হাউস-পালিত জীবনে স্বাভাবিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আভিধানিক অর্থে নহে। অন্য সমাজে যে কারণে যে কার্যের উৎপত্তি হয় আমাদের সমাজে সে কারণে সে কার্যের উৎপত্তি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস হইতে যে সকল সমাজতন্ত্রের সূত্র সঙ্কলন করিয়াছ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রয়োগ করিতে যাইও না।

"আমি বলিতে চাহি যে, এই অস্বাভাবিকতাই আমাদের সমাজশরীরের সকল ব্যাধির নিদান ; এখন ইহাই একমাত্র ব্যাধি ; অন্য সকলই তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র।"

("সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার")

দৃষ্টান্ত দিয়ে এ বক্তব্য বিশদ করতে গিয়ে এমন বাক্য লেখেন যা আমাদের চেতনায় বিঁধে থাকে,

"আমরা উদরান্নের সংস্থান না করিয়াও বিলাতী পণ্যদ্রব্যে ঘর সাজাই, বিলাতের বণিকেরা ভাবে, কেমন শিকার মিলিয়াছে।"

এমন-সব বাক্যে অব্যর্থভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের মুঠিতে ধরা ভারতীয় জীবনের ট্রাজিডি ঝলসে ওঠে।

একই প্রসঙ্গের স্পষ্টতর বিশ্লেষণ পড়ি "অরণ্যে রোদন" প্রবন্ধে :

"...আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র সম্প্রতি বর্তমান, অধ্যাপক সীলি সেই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে inorganic state অঙ্গহীন বা ছিন্নাঙ্গ, সুতরাং জীবনহীন রাষ্ট্র সংজ্ঞা দিয়া তাহাকে আলোচনার অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাত করিয়াছেন। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি বৈদেশিকের হস্তে ; যেখান হইতে শক্তির পরিচালনা হয়..

তাহার সহিত সমগ্র সমাজের কোন জীবন সম্বন্ধ নাই, কোন চেতনার সম্পর্ক নাই। মৃত্তিকা রস যোগাইয়া ও সার যোগাইয়া গাছকে পোষণ করে সত্য কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকা গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধ্যে গণ্য হয় না ; সেইরূপে আমরাও কর দিয়া যোগাইয়া রাষ্ট্রের পোষণ করিতেছি, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা রাষ্ট্রের অঙ্গমধ্যে গণ্য নহি ; আমরা রাষ্ট্ররূপী বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল কিছুরই মধ্যে নহি. আমরা তলস্থ উর্ব্বরা ভূমি মাত্র ; তাহার উপর ভর দিয়া বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে. তাহার রস শোষণ করিতেছে, এবং তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া ছায়া দিতেছে. এবং প্রতিবেশী গাছ আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে।"

("অরণ্যে রোদন")

এই সূত্রেই রামেন্দ্রসুন্দরের "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধটির কথা মনে আসবে। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন বছর দুয়েকের মধ্যেই বেশ ঝিমিয়ে আসে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের উপসর্গ দেখা দেয়। যে আবেগ ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল তাকে কোন্ ধারায় চালিয়ে নিলে সারা দেশ একটা স্থির দিশা পাবে — আন্দোলনের নেতাদের কাছেও যেন সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল না। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ "ব্যাধি ও প্রতিকার" নামে প্রবন্ধে দেশের মানুষকে সংযত হবার পরামর্শ দিলেন। আক্ষেপ করে বললেন — এত বড়ো একটা আন্দোলন শাসক পক্ষকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। তারা দেশের মানুষের ক্ষোভকে কোনো মূল্যই দিলেন না। কর্তৃপক্ষের এই ঔদ্ধত্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে আরও বললেন, নিজেদের শক্তির পরিমাপ না করে উত্তেজনা কেবলই বাড়িয়ে চলায় সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। গোটা পরিস্থিতির অনিশ্চয়তায় রবীন্দ্রনাথের বিচলিত মানসিকতা ভাষা পেয়েছিল এই প্রবন্ধে। তিনি পরামর্শ দিলেন, বৃথা উত্তেজনায় মেতে না উঠে দেশকে সমর্থ করে গড়ে তোলার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করাই যথার্থ পথ।

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল. 'প্রবাসী'তেই আশ্বিন সংখ্যায় একই নামে রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধের সূচনায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, "প্রতিবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে।" কিন্তু গোটা প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অবস্থান এবং বিশ্লেষণ রামেন্দ্রসুন্দর প্রত্যাখ্যান করলেন। মূল প্রশ্ন কী. কেন আমরা নিজের পায়ে নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারলাম না. আমরা দেশের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে চাইনি বলেই কি ইংরেজ দায়িত্ব বহনের দায় নিজেদের উপরে তুলে নিয়েছে, আন্দোলনের পথে গিয়ে দেখা গেল ইংরেজ রাজা ধৈর্যভ্রষ্ট হয়ে "লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন" — ধীরভাবে দেশের কাজে প্রবৃত্ত হলে যে রাজশক্তি আমাদের অভিপ্রায় মতো কাজ করতে দেবে তার নিশ্চয়তা কী — তীক্ষ্ণ

এইসব প্রসঙ্গ এল রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাটিতে। তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, যার হাতে "বেয়নেট সমেত রাষ্ট্র শক্তি নিহিত আছে" তার স্বার্থের বিরোধী যে-কোনো উদ্যোগ আক্রান্ত হবেই। শাসক এবং শাসিতের সম্পর্কের মধ্যে শাসিতের কোনো স্বাধীন অভিপ্রায় প্রশ্রয় পায়না। আশুতোষ চৌধুরীর একটি উক্তি তুলে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন,

"এইরূপে অনেকেই বলিতেছেন, স্বদেশীকে রাজনীতির সহিত জড়ান একেবারেই উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের 'অনেস্ট্ স্বদেশী' থাকাই কর্ত্তব্য। এই শেষ কথাটা আমি একেবারেই বুঝিতে পারি না। দেশের শিল্পের উন্নতিই 'অনেস্ট্ স্বদেশী'র একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন আমাদের শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী শিল্পের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, আমরা যে পরিমাণে নিজের তৈয়ারি জিনিস ব্যবহার করিব বিলাতের তৈয়ারি জিনিসের আমদানি ঠিক সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে, তখন এই 'অনেস্ট্ স্বদেশী'ই বা কিরূপে মাথা তুলিবে, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পীর কোষে অর্থ সঞ্চয় কম হইবে, সেখানকার মজুরেরা অন্নাভাবে মনিবের জানালা ভাঙ্গিবে, আর ইংরেজের শাসননীতি নিদ্রামগ্ন হইয়া নাক ডাকাইবে, ইহা কি বিশ্বাস্য? যতদিন ইংরাজের বাণিজ্যনীতির পশ্চাতে ইংরেজের বেয়নেট থাকিবে, ততদিন অনেস্ট্ স্বদেশীর মাথা তুলিবার ক্ষমতা কতটুকু? বলা বাহুল্য, বাইবেলের ইংলণ্ডীয় রাজ সংস্করণ মধ্যে বাণিজ্য নীতির পশ্চাতে বেয়নেট ধরিতে কোথাও নিষেধ নাই।"

("ব্যাধি ওপ্রতিকার")

১৯০৭ সালের সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে এমন নির্মোহ নিঃসংশয় ধারণার নজির খুব বেশি মিলবে না।

এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল লেখা থেকে যতটা পড়া গেল তাতে প্রতিপন্ন হয়, ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক পর্বে যে গোটা পরিস্থিতি "অস্বাভাবিক" এবং দেশের ভূত-ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ অস্বাভাবিকতা যে ইংরেজদের বাণিজ্যিক-সাম্রাজ্যিক স্বার্থের ফল — এ বিষয়ে তিনি খুব স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর আলোচনার ভাষা মূলত যুক্তিনিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু সেই ভাষাশৈলীর মধ্যে প্রচ্ছন্নে বহে চলে এক যন্ত্রণাবোধের প্রবাহ। সে যন্ত্রণাবোধ মাঝে মাঝে ভাষাকে শ্লেষময়, ব্যঙ্গে জ্বালাময় করে তোলে। আবেগ-স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা। এই যন্ত্রণাবোধ, এই আবেগ মানুষটির ভেতরের খাঁটি স্বদেশি ব্যক্তিত্ব উন্মোচন করে দেখায় আমাদের। দেশের মাটি থেকে পা তুলে শূন্যে ভাসেন নি, তাঁর ভাবনায় তাই ত্রিশঙ্কুর সংকট নেই। আছে স্থির দৃষ্টিকোণ। দেশের ইতিহাসে আধুনিকতার সমস্যা এবং সংকট তিনি স্বদেশের স্বাভাবিক বিকাশের দিক থেকে সাজিয়ে বুঝতে চাইতেন। সে সম্ভাব্য স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত এবং বিকৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের অস্বাভাবিক চাপে।

এ বাস্তব সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় তখনকার অগ্রণী মনীষীদের মতো তাঁরও অন্বিষ্ট। এই বড়ো পটে রেখে তিনি শিক্ষার সংকট কোথায় বুঝতে চেয়েছেন।

১৯১৯ সালে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়। এর ঠিক আগে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ এবং একজন অগ্রগণ্য শিক্ষাবিদ্ হিশাবে তিনি স্যাড্‌লার কমিশনে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মর্যাদা পেয়ে আসছে। প্রতিবেদনটিতে রামেন্দ্রসুন্দরের দীর্ঘ শিক্ষা চিন্তার পরিণত এবং সংহত বিবৃতি পাই। এর মূল কথাগুলি বুঝে আমাদের নিতে হবে।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই এক বিদেশি গাছ, বিদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠা একজাতের গাছ যা এদেশে আমদানি করা হয়েছে। আমদানি করা হয়েছিল আকস্মিকভাবে চালিয়ে দেওয়া এক রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থায় নতুন জীবনপরিবেশের জরুরি প্রয়োজনে। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতারা এদেশের শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষাপদ্ধতি বিবেচনা করে দেখবার সময় পাননি। যেসব প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এক প্রাচীন জনসমষ্টির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত তার কিছুই না জেনে এবং তাকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নতুন ব্যবস্থা চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ ছিল আকস্মিক জরুরি অবস্থার প্রয়োজন মেটাবার সাময়িক ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থাপকদের একটা (শিক্ষা) যন্ত্র দাঁড় করিয়ে দিতে হল, কিন্তু যে জনসমষ্টির উপকারের জন্য যন্ত্রটি তৈরি করা হল তাদের আত্মিক ও সামাজিক জীবনে এ বস্তু অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যাবে কিনা ভেবে দেখবার অবকাশ তাঁরা পেলেন না।•

• "The University of Calcutta is altogether a foreign plant imported into this country, belonging to a type that flourished in foreign soil. The importation was an urgent necessity of the time, suddenly created by the abrupt introduction of new conditions of life with a new order of political situation ; the founders of the new educational system had not the time to study the ideals and methods that were indigenous : the new system was introduced in entire ignorance and almost in complete defiance of the existing social order regulating the everyday life of an ancient peole. It was a temporary device necessitated by a sudden demand and a sudden

রামেন্দ্রসুন্দরের এ বক্তব্যে মেকলের পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনার জের রয়েছে।

কী ফল ফলিয়েছে এই শিক্ষা পদ্ধতি? পরের অনুচ্ছেদেরই তার হিশাব দিচ্ছেন এইভাবে—

প্রতিষ্ঠান হিশাবে, একটা যন্ত্র হিশাবে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যর্থ হয়নি। মূল উদ্দেশ্য প্রশংসাযোগ্যভাবেই সাধন করেছে।...রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারি যোগান দিয়েছে, যাঁরা বৃটিশ শাসনের উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কর্তব্য পালন করেছেন এবং করে চলেছেন। মার্জিত এক নাগরিক শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে, যে শ্রেণী পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে সূচিত পরিস্থিতিতে সামাজিক জীবনের উপরে যথাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছে। আরও মূল্যবান লাভ, নিজেদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্নভাবে সংকীর্ণতাময় রীতিনীতিতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত এক প্রাচ্য মানব-সমষ্টির একেবারে জীবনের ভিত্তিটি প্রশস্ত করেছে এই শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে পাওয়া পাশ্চাত্য চিন্তা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রশস্ত করেছে। নতুন কর্তব্য এনেছে আমাদের সামনে, নতুন উদ্যম জাগিয়ে তুলেছে। দেশ আজ নব-জীবনের প্রেরণায় জাগর, বিশ্বের নিত্য সংগ্রামময় জীবনে যোগ্য ভূমিকা নেবার আয়াস করছে। সাধারণভাবে নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতির বনিয়াদে নির্ভর করে বিশ্ব-মানবের কাছে নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করতে পারে — এমন এক ধরনের ভারতীয় মানুষ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।•

বিশ্ববিদ্যালয় বাহিত আধুনিক শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের কথা কখনওই বলেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। বরং নিজের জীবনের যা-কিছু মূল্যময় অর্জন, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে পাওয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। বলেছেন, বিদ্যার কোনো জাত নেই। বিদ্যায় কারও একচেটিয়া অধিকার থাকতে পারেনা। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের যাবতীয় বিদ্যায় সর্বমানবের সমান

---

emergency. The framers of the device had to plan out a machinery, but had not the opportunity to think out whether it would organically blend with the life, "—spiritual and secular, of the people for whose benefit it was intended. ?—Michael Sadler, *Report Of the Calcutta University Commission, 1919, Vol. VII* (Evidence and Documents) p. 303.

• The University however has not failed as an institution

অধিকার মান্য। জ্ঞানের বস্তু সম্পর্কে তাঁর আপত্তি নয়, আপত্তি — এক অস্বাভাবিক শিক্ষা প্রণালীর মাধ্যমে সেই সর্বজনের প্রাপ্য জ্ঞানের বিকিরণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা সম্পর্কে।

এই প্রণালীর প্রসঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দর বারবার বিদ্যা বিকিরণের আবহমান দেশি প্রণালীর তুলনা আনেন। প্রতিপন্ন করেন, ইংরেজের ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কখনওই ভারতবর্ষে বিদ্যার বস্তুকে পণ্যে পরিণত করা হয়নি। ডিগ্রির সঙ্গে চাকরির লক্ষ্য জুড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা ভালো-মন্দ বাছাইয়ের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সিলেবাস, নির্ধারিত পরীক্ষা বিধি, পরীক্ষার জন্য এবং পঠনপাঠনের জন্য ছাত্রের পক্ষে দেয় নগদ অর্থ — সব মিলিয়ে বণিকরাজ বিদ্যাকেও বিক্রয়যোগ্য পণ্য করে তুলল। সে

---

and as a machinery. It has done admirably the work that it was primarily intended to do. It has admirably served the purpose for which it was primarily intended. It has given the State a body of faithful and able servants that have done and have been doing their duty in the new political situation created by British rule; it has produced a body of cultured citizens who are wielding their legitimate influence on civic life under the conditions introduced by close contact with the West. What is more valuable still, it has broadened the very base of life of an oriental people hitherto accustomed to move along the narrow lines and ways of their own in the seclusion imposed upon them by their own history and their geography. Western thought and Western culture brought to us through the Universities have widened our field of vision, have placed before us new duties, have created new aspirations, and to-day the land is astir with the prompting of a new life, struggling to participate in the eternal conflict of life in the world; striving to bring forth a type of Indian humanity which, broadly and securely based on the foundations of its own special culture, will assert itself in the presence of the manhood of the world." (*Ibid.* pp. 303-04).

পণ্য কেনবার সাধ্য নেই দেশবাসীর। এই প্রসঙ্গেই তিনি পাশ্চাত্যের প্রাচীন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীন কর্মধারার কথা আনেন। তাদের কাজের স্বাধীনতায় কোনো সরকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার কথা ভাবতেও পারেনা। কিন্তু পরাধীন ভারতে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বসানো হল তার স্বাধিকার বলে কিছু মানা হলনা। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করার অভিপ্রায়ে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখান, একদিক দেশের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার জন্য জায়মান ব্যাকুলতা, অন্য দিকে সরকারের শিক্ষা সংকোচ নীতি — দুয়ের বিরোধ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জোয়ারের দিনে স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প অনিবার্য করে তুলেছিল; সে প্রকল্প বাস্তবে মূর্ত করা যায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাকেন্দ্র — একটা বিকল্প নজির হিশাবে দাঁড়িয়ে গেল। স্বাধীন শিক্ষার ধ্যান এ দুটি প্রতিষ্ঠানে ছোটো আকারে হলেও ধরে রাখা যে গেল — এর পেছনে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার একটি সুস্পষ্ট প্রেরণাই কাজ করে চলেছিল বলে রামেন্দ্রসুন্দর বিবেচনা করেন।

বিদ্যা সর্বজনের অধিকারের বিষয়। তেমনি কোন্ প্রণালীতে বিদ্যা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, স্থির করতে হবে প্রত্যেক দেশের নিজস্ব প্রবণতা, নিজস্ব পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত ভাবে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন,

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্যা প্রাচ্য মানুষের মনের পক্ষে বিসঙ্গত ভেবে তার আয়ত্তের অগম্য করে রাখা যাবেনা, কিন্তু তবুও প্রাচ্য মানুষকে তাদের ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের পক্ষে সুসঙ্গত পদ্ধতিতে ও উপায়েই এ বিদ্যা অর্জনের অধিকার দিতে হবে।•

এই দাবিকেই আধুনিক শিক্ষা আমাদের জাতীয়তার ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি বলা যায়। এ দাবি রামেন্দ্রসুন্দর অনেক আগে থেকে উচ্চারণ করে এসেছেন। বারবার বলেছেন, শিক্ষা বিকিরণের পদ্ধতি ও প্রকরণ ঢেলে সাজানো দরকার। আমলা কেরানি তৈরির প্রকল্প হিশাবে গড়া গোটা ব্যবস্থাটা ভাঙা দরকার। বিলাতি বিদ্যা যে নিষ্ফলা হয়ে রইল তার কারণ,

"আমরা জানিয়াছি অনেক ও শিখিয়াছি অনেক; কিন্তু কিরূপে জানিতে হয় ও কিরূপে শিখিতে হয়, তাহা শেখা আবশ্যক বোধ করি নাই। মনুষ্য

• "Knowledge of the western sciences cannot be withheld from an eastern people, as something alien to them; but an eastern people may still be allowed its possession by methods and means best suited to their traditions and their needs," (*Ibid.* p, 304)।

জাতির জ্ঞানের রাজ্য আমাদের কর্তৃক এক কাঠা কি এক ছটাক পরিমাণেও বিস্তার লাভ করে নাই।"

("ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম")

নব্য শিক্ষার পরিণাম চিন্তায় ১৮৯৫ সালে লেখা এই প্রবন্ধে এক করুণ ছবি ফুটিয়েছিলেন,

"ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আবির্ভাবকালে যে সকল মহারত্ন সহসা আবির্ভূত হইয়া সমাজকে উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের উৎসাহবহ্নি শেষ পর্যন্ত হাকিমী, উকীলী, কেরাণীগিরি প্রভৃতিতে কথঞ্চিৎ উপশমিত হয়। সেই অবধি আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার বলে হাকিম ও উকীল ও কেরাণীতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল।...এ যদুকুল আর বাড়াইয়া ফল কি।"

("ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম")

বিশাল ভারতবর্ষকে শাসনে রাখার জন্য যে নিপুণ নিখুঁত শাসন যন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে, শিক্ষাও তেমনি এক যান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা। মানবিক অনুভূতির স্পর্শ বর্জিত। ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসার যান্ত্রিক পদ্ধতির বিকল্প কী হবে—এ প্রশ্ন বার বার উঠেছে। সে বিকল্পের ভাবনায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, শিক্ষার্থীকে কিছু কাজের জ্ঞান দিয়ে দেওয়া নয়, তার মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশই হতে পারে শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। মানব সন্তান কোনো ক্ষুদ্র যন্ত্র নয়, একটি সজীব পদার্থ। অন্তত একটা উদ্ভিদকে লালন করে বড়ো করে তোলার পদ্ধতি মানব শিশুর বেলায়ও মানতে হয়। উপমার জের টেনে বলেন,

"প্রশস্ত স্থানে রসপরিষিক্ত মৃত্তিকার মধ্যে খোলা বাতাসে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাকে স্বাধীনভাবে বাড়িতে দাও... ।"

("শিক্ষাপ্রণালী")

তাকে কি নীতি শিক্ষা না দিয়ে, ধর্ম শিক্ষা না দিয়ে মানুষ করা যাবে? শিক্ষা চিন্তায় এসব ভ্রান্ত যুক্তির পিছুটান রামেন্দ্রসুন্দরের মনে প্রশ্রয় পেত না বলেই লিখতে পারেন,

"আমাদের ইচ্ছা, শিক্ষা যেন বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মসঙ্গত হয়। বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মসঙ্গত দুইটা বিশেষণ পৃথক করিয়া ব্যবহার করিলাম, তাহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা একরূপ ও ধর্মসঙ্গত শিক্ষা অন্যরূপ, দুইটা দুই কালের শিক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যাহা বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই ধর্মসঙ্গত ; যাহা বিজ্ঞানসম্মত নহে, তাহা ধর্মসঙ্গতও হইতে পারে না।"

("শিক্ষাপ্রণালী")

স্পষ্টত 'ধর্ম' শব্দটি তাঁর ভাবনায় প্রথাসম্মত তাৎপর্যের বাইরে এসে পড়ছে।

মনুষ্যত্ব ধর্মের পূর্ণ বিকাশের জন্যই তিনি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের শিক্ষাপদ্ধতি বাইরে থেকে আমদানি করা যাবে না। জাতীয় স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের মাটিতে সে পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলবার জন্য "আমাদের ভগ্ন কুটিরের মধ্যে...যাহা আমাদের নিজস্ব, অথবা যাঁহাদের শোণিত আমাদের ধমনীমধ্যে বহিতেছে — উঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত" বস্তুর উপরে একান্তভাবে নির্ভর করাই সফলতার উপায়।

এ রকম ধারণায় পুনরুজ্জীবনবাদী ঝোঁক এসে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যা আমাদের পরম্পরাগত সেই বস্তুই শ্রেয়, তাকে ফিরিয়ে আনাই একমাত্র কৃত্য — পুনরুজ্জীবনবাদী এই পরামর্শ দেবেন। রামেন্দ্রসুন্দর সুস্পষ্ট ভাষায় পুনরুজ্জীবনবাদের, রিভাইভালিজমের বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন,

"অতীতের নাম উল্লেখ করিবা মাত্র এক সম্প্রদায়ের লোক আমার প্রতি ভীতিবিহ্বল নেত্র স্থাপিত করিবেন। তাঁহারা ভাবিবেন, — হয়ত আমি আমার স্বদেশীয়গণকে ভবিষ্যতের মুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়া অতীতের মুখে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আহ্বান করিব। তাঁহাদের আগে চলা বন্ধ করিতে বলিয়া পাছু হাঁটিতে উপদেশ দিব; কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখি, তাঁহাদের এরূপ আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। সমাজ-ঘড়ীর কাঁটাকে ফিরাইয়া দিবার আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই।"

("সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার")

আধুনিক মন পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করেনা। কিন্তু কোন্ শক্তিতে শোষণের পীড়নের অসহ্য চাপ সত্ত্বেও স্বদেশের সমাজ আপন সজীবতা বজায় রাখতে পেরেছে — সে সত্য বোঝা আধুনিকেরই দায়। কারণ রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেন,

"যদি আমাদের সামাজিক ব্যাধির কোনো ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, তাহা এই আত্মসমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা।...যদি আমরা কখনও রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক প্রহসনের অভিনয় ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাই, আমাদের এই প্রাচীন সমাজের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা হইতেই সে ক্ষমতা উৎপন্ন হইবে।"

("সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার")

আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক মনন স্বদেশের মাটিতে শিকড় মেলতে না পারলে অবান্তর হয়ে থাকবে — এই কথাটা রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিকল্প শিক্ষাতত্ত্ব বলতে তাঁর ধারণায় আসে, এমন এক শিক্ষাপ্রণালী — যা আধুনিকতম বিদ্যাকে বিনা বাধায় গোটা সমাজে সঞ্চারিত করে দিতে পারে।

সে বড়ো দুরূহ সাধন। ঔপনিবেশিক আধুনিক শিক্ষা "শিক্ষিত"কে স্বদেশের বিপরীত মুখে চালনা করেছে। এই সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় নিজের সমাজকে বোঝার আন্তরিক আয়াস। বড়ো মর্ম-ছোঁয়া ভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর অনুনয় করেন, --- আমাদের খুঁজে দেখতে হবে সমাজের কোথায় কী আছে, সমাজশরীরের কোথায় কয়টি শিরা, কোন্ খাতে রক্ত চলাচল করে আজও, কোন্ স্নায়ু দিয়ে চেষ্টাশক্তি পরিচালনা সম্ভব। বলেন --- দরকার অনুরক্ত, অন্তরঙ্গ, আত্মীয়ের সকরুণ সপ্রেম অনুসন্ধান। এ অনুরাগ বাইরে থেকে আমদানি করা সম্ভব নয়। নিজেদের ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হয়।

দেশ কোন্ উপায়ে কবে স্বরাজ পাবে, স্বাধীন শিক্ষাবিধি গড়ে তুলবে --- সে জল্পনা নেই রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায়। সাদা চোখে সত্য দেখা তাঁর স্বভাবগত। প্রতি পদেই মনে রাখছেন, "...জাতির সমস্ত শুভাশুভ পরহস্তগত, যাহাদের পায়ে শিকল, হাতে শিকল, গলায় শিকল।" ("অরণ্যে রোদন")। সেই স্বজাতি, স্বদেশের উদ্দেশে বড়ো আদর্শের উপদেশ বিতরণে তাঁর রুচি ছিলনা। স্বদেশের যাবতীয় সংকট থেকে উদ্ধার গোটা দেশের সঙ্গে একাত্মতার পথে সম্ভব --- শুধু এই ভাবনামন্ত্র উজ্জ্বল করে তুলতে চেয়েছেন।

তাঁর জীবনে একাত্মকতার সাধনায় যে কোনো খাদ ছিলনা, নিজের কাজের এলাকায় নিত্য তার প্রমাণ মিলত। মাতৃভাষা ভিন্ন ইংরেজিতে কিছু লিখলেন না জীবনে। কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছেন বাংলায়। এ এক অভাবনীয় ঘটনা তখন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ইংরেজিতে প্রবন্ধ পড়তে দুবার অসম্মত হন। তৃতীয়বারে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বাংলাতেই বলতে অনুমতি দিলে আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। বাংলায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ভিন্ন কোনো নতুন বিদ্যা জাতির মনন-শরীরে স্থায়ী হতে পারেনা --- এই নীতি স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার তিনি চেষ্টা করেন। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু উল্লেখ করেছেন, ১৯০৪-০৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধি তৈরির সময়ে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আনা একটি প্রস্তাব সেনেট সভায় বাঙালি সদস্যদের মধ্যে একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর সমর্থন করেন। গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "সেই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় শুনিয়াছি।" (আশুতোষ বাজপেয়ী, 'রামেন্দ্রসুন্দর', ১৩২০ পৃ. ৮৮)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠানটির কাজ রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনযাপনে ওতপ্রোত ছিল। সেও তো এই একই কারণে যে তিনি পরাধীন স্বদেশে একান্তভাবে একটি স্বদেশি অনুষ্ঠান পরিষৎকে এক পবিত্র আশ্রয় মনে করতেন। পরিষদের কর্মধারার মাঝ দিয়ে দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ অনুভব করতেন। কার্জন বাংলা ভাগের আদেশ জারি করলেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ) বঙ্গভঙ্গের দিনটিতে রামেন্দ্রসুন্দর অরন্ধন পালনের আবেদন জানান, একান্ত দেশ

প্রথায় কোড প্রকাশের এই ব্রত পালনের জন্য লেখেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। লেখাটি আজও দেশ ভাবনার ভাবুকের মর্ম সকরুণ করে তোলে। দেশের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার আবেগ জাগিয়ে দেয়।

৪

ঔপনিবেশিক শিক্ষাতত্ত্বের বিকল্প সন্ধানের মূলে ছিল বিচ্ছিন্নতা বোধ। ইংরেজের শিক্ষা পরিকল্পনায় য়ুরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-অর্থবিদ্যা-বিজ্ঞান পড়া একটি শিক্ষিত ভদ্রলোক জনস্তর তৈরি হয়ে উঠল। এই জনস্তরের কাছে ইংরেজ একান্ত এবং পরিপূর্ণ বশ্যতা প্রত্যাশা করেছে। এরাই মেকলের হিসেব মতো রাজের সহযোগী মানুষ। বশ্যতার বাধ্যবাধকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রণী পুরুষেরা যে সকলেই কম বেশি মেনে চলেছেন তার বহু প্রমাণ সহজেই পাওয়া যাবে। স্মরণ করুন, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা সকলেই সি-আই-ই। (Companion of the Indian Empire) খেতাব ধারণ করতেন। সরকারি চাকুরে না হওয়া সত্ত্বেও রাজভক্তি দেখাবার অনুষ্ঠানে রামেন্দ্রসুন্দরকেও সামিল দেখা যাবে। তাঁর জীবনীকার লিখছেন, "গত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতসম্রাট্ বঙ্গদেশে আগমন করেন, রামেন্দ্র সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আরও কতিপয় সভ্যের সহিত বড়লাট মহাশয়ের উপদেশক্রমে সম্রাট্কে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রিন্সেপ ঘাটে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে সম্রাট্কে অভিবাদন করিবার জন্য তিনি রাজপ্রাসাদে আহূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

(আশুতোষ বাজপেয়ী, 'রামেন্দ্রসুন্দ', পৃ, ৯০)

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অধীন ভারতবর্ষের সেই বাতাবরণে এঁরা সরকারি বদান্যতায় সাড়া না দিয়ে পারতেন না। বিপরীত প্রতিক্রিয়াটাও যে প্রখর ছিল তার প্রমাণও কিছু কিছু আমরা দেখলাম। রাজপ্রসাদ, রাজার হাতের সওগাত —নানান্ খেতাব, মান-মানাত্য যেন এঁদের বুঝিয়ে দিত — এই হল "সুসিদ্ধ কাউন্সিল কারির" আয়োজন। এখানে লাঙল চষা "হাসিম শেখ রামা কৈবর্ত"-রা নিতান্তই অবান্তর। অথচ যা-কিছু দেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছে তার অধিষ্ঠান ভূমি যে এই শতকরা ৯৯ জন অবান্তর মানুষ — এ সত্য এড়িয়ে যাবার উপায় থাকছিল না। "শিক্ষিতে"-র স্বদেশভাবনা এই বিচ্ছিন্নতার সামনে থমকে যায়। কেউ কেউ ধরতে পারেন, বৃটিশ সরকার আছে এ প্রবল সত্যের চেয়ে প্রবলতর সত্য সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে বহুদূরে অবধি বিস্তৃত আছে এক বাস্তব স্বদেশ। সচেতন কর্তব্যবোধ নিয়ে, দায়বোধ নিয়ে, "প্রাণের বেদনা নিয়ে" সেই স্বদেশের মধ্যে যাবার গরজ আসে কারও কারও

চেতনায়। প্রতিষ্ঠিত, অবিচল, আপাতভাবে প্রতীয়মান সর্বগ্রাসী বিধি ব্যবস্থার বিকল্প খুঁজতে এঁরা বাধ্য হন। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় এ বোধের তীব্র সংবেদন ঘনিষ্ঠ পাঠক বার বার পাবেন। তাঁর কণ্ঠেই শুনবেন,

"এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে, রাজদ্বারে মাথা না ভাঙ্গিয়া এই জনসঙ্ঘের দুয়ারে গিয়া বসিতে হইবে।"

("ব্যাধি ও প্রতিকার")

শুনতে পাবেন, ইংরেজ নাই অথচ স্বদেশ আছে দেশবাসীরা আছে — এই সহজ অথচ ভদ্র-সাধারণের বোধের অগম্য কথাটা তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

"এত বড় একটা বিশাল দেশের কাজকর্ম স্তূপাকার করিলে বিশালই হয় এবং সেই বিশাল কাজকর্ম্ম যত ছোট আকারেই হউক, সে কালে চলিয়া যাইত এবং রাজার সম্যক্ সাহায্য ব্যতীতও দেশটা বর্ত্তমান ছিল; দেশ জুড়িয়া এই জনসঙ্ঘও বর্ত্তমান ছিল। রাজশাসনের অভাবে বঙ্গদেশ বঙ্গসাগরে ডুবিয়া যায় নাই। বঙ্গদেশ ছিল বলিয়া ইংরেজ আজ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। পুরাতন চৌদ্দ পুরুষে কোনরকমে কায়ক্লেশে দেশটাকে এত দিন ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ আজ এখানে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন।"

("ব্যাধি ও প্রতিকার")

এই বৃহৎ বাস্তব স্বদেশকে উপেক্ষা করে আধুনিক প্রগতির কোনো আয়োজন সফল হতে পারেনা। সচেতন স্বদেশ জিজ্ঞাসুকে তাই মুখ ফেরাতে হয়, আপন দেশের মানুষের সঙ্গে নাড়ির যোগ কোথায় — খুঁজতে হয়। ভাবতে হয় কোন্ ভাষায় কেমন ভাব-তরঙ্গে কথা বললে সেকথা দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের মর্মে সাড়া জাগাবে।

ইংরেজ নেই, স্বদেশ আছে। আজও এমন কোনো প্রণালী, এমন কোনো বিধিব্যবস্থা করে ওঠা গেল না যার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা দেশের সর্বায়ত জীবনে চারিয়ে দেওয়া যায়। আমরা সেই একই সংকটে আছি। তাই রামেন্দ্র-সুন্দরদের উপলব্ধি,-মনন-উদ্যম থেকে কিছু ইঙ্গিত পাবার আকাঙ্ক্ষা এখনও প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

স্বর্ণশিখা
বহরমপুর কলেজ রজতজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা
জুন ১৯৯০

দ্বিজেন্দ্রলাল
স্মরণ বিস্মরণ

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের ধারে বড়গাছিয়া গ্রামে থাকি। এক ঝাঁক ছাত্র এসে বলল, "রবিবার সকালে আমাদের দলের যাত্রা। থাকবেন কিন্তু স্যার। চন্দ্রগুপ্ত পালা।" সকলেরই বয়স ১৪-র মধ্যে। এদেরই নাকি যাত্রার দল। রবিবার সকালবেলায় আসরে গিয়ে বসা গেল। একটা হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলা ছাড়া কোনো বাজনা নেই। তাতেই সুর ভাঁজা চলে এবং ঠিক সময়ে পালা শুরু হয়ে যায়। অবাক করা দৃশ্য। একের পর এক চরিত্র আসছে -- সবারই এক পোশাক। সেকেন্দার-সেলুকাস-চন্দ্রগুপ্ত-কাত্যায়ন-চাণক্য ; মায় হেলেন-ছায়া-মুরা সব স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট পরে আসরে নামছে। কোথাও এ নিয়ে কৌতুক নেই, হাসি নেই। দাপটে অভিনয় করে গেল এবং তুঙ্গ মুহূর্তগুলোয় ঠিক ঠিক হাততালি কুড়োলো। গাঁয়ের পাঁচমিশালি শ্রোতারা ডি. এল রায়ের নাটকে মজে রইলেন সারাটা সকাল।

সুধীর চক্রবর্তীর নতুন কাজ 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ' বইখানা পড়তে পড়তে সেই সকালের কথা খুব মনে পড়ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লোক-চিত্ত থেকে সম্পূর্ণই মুছে গেছেন -- এ নয় বোধ হয়। দূরে দূরে মফস্বলে এখনও তাঁর নাটক পুরানো ধাঁচে অভিনয় করেন শৌখিন নাট্যসংঘ। তাঁর গান তো শোনা যায়ই, হয়তো অবিকল দ্বিজেন্দ্র-সুরে নয়, যেমন সুধীর দেখিয়েছেন।

তবু এও ঠিক, দ্বিজেন্দ্রলাল আর বাঙালি সংস্কৃতির কোনো সমারোহের উপলক্ষ নন আজ। আড়ালেরই মানুষ। সংস্কৃতির চলমান ধারায় তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চর্চা খুব জরুরি মনে করা হয়না। একটা সময় অবধি আসরের একেবারে মাঝখানেই ছিলেন। কেন সে মর্যাদা হারালেন — এই জিজ্ঞাসা নিয়ে দ্বিজেন্দ্র-লালের ব্যক্তিজীবন এবং সৃষ্টির ভুবন নতুন করে পিঁজে পিঁজে দেখা হয়েছে এই বইয়ের ৬টি পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদ ৬টি—১. অবহেলিত উত্তরাধিকার ; ২. গদ্যের হাতুড়ি, পদ্যে ; ৩. স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব ; ৪ দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি ; ৫. বাংলা গানে বিলাতি চাল এবং ৬. পুত্রের চোখে পিতা। পরিশিষ্টের ৫টি অংশে সংকলিত আছে "দ্বিজেন্দ্রলালের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও রচনা পরিচয়", "দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ব্যবহৃত গানের তালিকা", "স্বরলিপি-বদ্ধ দ্বিজেন্দ্রগীতির বিবরণ ও তালিকা", "দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ে দুটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা" (প্রিয়নাথ সেন এবং বিনয়কুমার সরকারের লেখা, বিনয়কুমারের কবিতাটি

ইংরেজিতে), এবং "শ্রীঅরবিন্দ-কৃত দ্বিজেন্দ্র গীতির ইংরাজি অনুবাদ" ('যেদিন সুনীল জলধি হইতে' এবং 'বঙ্গ আমার, জননী আমার…') ।

ব্যক্তিজীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সুখী গেরস্ত । গৃহিনী ছেলেমেয়ে নিয়ে মাধুর্যের সংসার যতদিন ভরপুর ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যও ততদিন অবিচল ছিল । সমাজের, জীবিকার জগতের আঘাত লাঞ্ছনা তাঁকে অভিভূত করেনি । বিলেত যাওয়ার অপরাধে একঘরে হওয়া বা লেখায় স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তিতে রাজরোষ — সব উপেক্ষা করে কবিতা-গান-নাটক রচনায় মেতে থেকেছেন । একই কালে রবীন্দ্রনাথ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠছিলেন, খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে রবীন্দ্রনাথের ছায়া কোনো ভাবেই পড়েনি । কবিত্বে, সাংগীতিক প্রতিভায়, এমন কী নাটকেও স্বীকৃতি সমাদর সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্টই পেয়েছিলেন । নিজের মধ্যে প্রতিভার স্বাদ পাওয়ায়, নিজের কাজের মূল্য-গৌরব সম্পর্কে সচেতনতায় মানুষ সাংসারিকতার উপরে এক সৃষ্টির অধিষ্ঠানভূমি তৈরি করে নেয় । স্রষ্টামানুষ এক ধরনের বিবিক্ত মানসিকতার অটল আশ্রয় রচনা করে । কোনো ক্ষতিই আর তাকে বিচলিত করেনা, টলায় না । সৃষ্টির পথে অনেক দূরে এগোলেও এই বিবিক্ত নিঃসঙ্গ স্রষ্টার চারিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাগেনি । একটি আঘাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য টলে যায় । স্ত্রীর অকালমৃত্যুর আঘাত । মাত্র ৫০ বছরের আয়ু-কালের (১৮৬৩-১৯১৩) উজ্জ্বল সৃজনশীল সময় ছিল ১৬টি বছর, বিবাহ থেকে স্ত্রীর মৃত্যু অবধি সময় (১৮৮৭-১৯০৩) ।

দ্বিজেন্দ্রলালের কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা এসেই পড়ে, এমন কী ব্যক্তি-জীবনের দিক থেকেও । সুধীর চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথেরও জীবনে একের পর এক শোকের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন । সেসব আঘাত রবীন্দ্রনাথের সৃজনপর ব্যক্তিত্বটিকে কখনও বিবশ করেনি । বিধ্বস্ত দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন, "সকলেরই এ সংসারে একটা কোনো আশ্রয় বা সান্ত্বনা থাকে । আর আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই । চারি দিকে শ্মশান, আর তার পর ধূ ধূ মরুভূমি ।" (২৬ পৃষ্ঠায় তোলা চিঠির অংশ) । এর পাশে সুধীর 'পুনশ্চ' বই থেকে নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পাবার দিনে লেখা বিশ্বশোক কবিতায় —

> দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি —
> লজ্জা দিয়ো না ।
> সকলের নয় যে-আঘাত
> ধোরো না সবার চোখে ।

এই কটি লাইন রাখতে পারতেন । এ পৌরুষ দ্বিজেন্দ্রলালে ছিলনা ।

দুটি সন্তান নিয়ে দিশেহারা দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুতেই জীবনটাকে আর গুছিয়ে নিতে পারেন না । "তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপে আশ্রয়

অবলম্বন আছে ; কিন্তু আমার তার কোনোটাই নাই, কিছুই নাই।" (২৪ পৃষ্ঠার তোলা চিঠির অংশ)। অনপনেয় বিষাদ এবং ভয়ংকর শূন্যতার চাপ এড়াবার জন্য জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি কেবলই বাইরের উত্তেজনার মধ্যে নিয়ে ফেলতেন নিজেকে। মদের নেশা তাঁকে ভালো রকম পেয়ে বসে। সুধীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, "সেই উত্তেজনা হতে পারে মদ্যপানের অনুষঙ্গে, হতে পারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনজনিত তৎসাময়িক মত্ত আবেগে, হতে পারে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জনচিত্তজয়ী ঐতিহাসিক বা দেশোদ্দীপনার নাটক লেখায় এবং একই ভাবে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অশোভন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায়।" (পৃ. ২৪-২৫)। নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারানো এক বিড়ম্বিত মানুষের চরিত্রমূর্তি আমাদের সামনে দাঁড় করান লেখক। সৃজনশক্তি যা ছিল এই মানুষটির মধ্যে তার কোনো শৃঙ্খলাময় পরিণতি সম্ভবই ছিলনা আর। ব্যক্তিত্বের ভরকেন্দ্র টলে যাওয়া মানুষ নিজেকে চালাতে পারেনা, চলে বাইরের ধাক্কায়। জীবনে এবং সৃজনে দ্বিজেন্দ্রলালের বিফলতার কথা, ব্যক্তিত্বের এবং বিচারবুদ্ধির দুর্বলতার কথায়ও অবশ্য লেখকের মমত্ব আমাদের গভীর স্পর্শ করে। অশেষ এই মমত্বের জন্যই বইখানিতে কঠিন সমালোচনার ঝাঁজ নেই কোথাও। অনুকম্পা আছে, খেদ আছে। যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষটির কীর্তির মূল্য-গৌরবটুকু চিনিয়ে দেবার যত্ন আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশক জুড়ে আধুনিক বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উর্বরতার মূল উপাদান ছিল স্বাদেশিক চেতনা। অকৃত্রিম গভীর আবেগে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেকে সে উদ্দীপনায় সঁপে দিয়েছিলেন। দুর্গত স্বদেশের উজ্জ্বল অভ্যুত্থানের স্বপ্ন জাগে উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বাবু ভদ্রজনের মধ্যে। আধুনিক মননে স্বাদেশিকতার তত্ত্ব-ধারণা সংগঠিত হয় ক্রমে। স্বদেশ তো ছিল আবহমান কাল, ছিলনা স্বাদেশিকতার তত্ত্ব। ছিলনা জাতিসত্তার ধারণা। এ বস্তু বিলেতের আমদানি এবং ইংরেজি শিক্ষিতেরাই এ আলোড়নের আধার। উপনিবেশে জাতীয়তার বোধ, স্বাদেশিকতার আবেগ অবধারিত চূড়ান্তে পৌঁছয় স্বাধীনতার স্বপ্নে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক সংগ্রামের ভেতর দিয়েই পূর্ণ হতে পারে। অবধারিত ভাবে তাই সংগ্রামের উদ্দীপনা সত্যি সত্যি কোনো রণক্ষেত্রে না হোক, ভাবের রাজ্যে শত্রুপক্ষ চিহ্নিত করে এবং অস্ত্র হানে। আর এইখানেই সমূহ সংকট ঘনায়। জাতীয় মুক্তির ভাবুক সংগ্রামী আবার প্রভু ইংরেজের চাকুরেও বটে ফলে কর্মচ্যুতি না-হোক, প্রোমোশন বন্ধ এবং ঘন ঘন বদলি মুক্তিসংগ্রামের আবেগ বেশ থমকে দিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও পারে, দ্বিজেন্দ্রলালকেও। ফলে হিসেব করে কথা বলার গরজ আসে। বক্তব্যকে ছদ্মবেশ পরাতেই হয়

দ্বিজেন্দ্রলালে এ পিছুটানের বেশ কিছু নজির রয়েছে "স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তি

বন্ধ" পরিচ্ছেদে। 'প্রতাপসিংহ' নাটক লেখার জন্য ক্রমাগত কাল করে হয়রান করা হচ্ছে বলে খুবে উষ্মা প্রকাশ করেন, "এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন কর্ব"। আবার "বঙ্গ আমার" গানের "আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা হৃদয়-রক্ত করিয়া শেষ" লাইনটা নিরীহ করার জন্য পাল্টে লিখছেন, "আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" আরও জানা যায়, বেশ কিছু স্বদেশি গান নিজে হাতে পুড়িয়ে দেন একবার। ঔপনিবেশিক বাস্তবতার এক মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ পায় তাঁর চিঠিতে, "চাকরি সম্বন্ধে কি আর বলিব? এর জন্য আমার জীবনটাই বৃথা হইতে বসিয়াছে। মানসিংহের (দ্র. 'প্রতাপসিংহ') সহিত আমিও বলিতে বাধ্য — 'মনে কর কি এই দাসত্বভার আমি বড় সুখে বহন কচ্ছি'।' কিন্তু কি করিব? অন্য উপায় নাই যে।" (পৃ. ৭৬)।

এই গ্লানিটা যেমন নিখাদ তেমনি আবার এমনও ভাবেন — দৈবক্রমে ইংরেজ যদি এদেশ ছেড়ে চলেই যায় তা হলে, "শ্যাল-কুকুরের অবস্থাও সেদিন আমাদের দুর্দশার কাছে বোধ হয় হার মানে", (পৃ. ৮৭)। ফলত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে শুধু শোক-সংগীত রচনাই করেন না কোরাসের দল গড়ে কলকাতার রাস্তায় সে গান গেয়েও বেড়ান। (পৃ. ৮৮)। আবার এই দ্বিজেন্দ্রলালই স্বদেশি গানের দল দেখে রাস্তায় নেমে আসতে পারেন এবং ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনিতে অম্বরতল রোমাঞ্চিত করে তুলতে পারেন। (পৃ. ৮৮)। এই মানুষেরই মনে অবমাননা বোধের গ্লানি দুর্বহ হয়, জ্বালা ধরায় যখন, তখন নিষ্করুণ ব্যঙ্গে বলেন — "পৃষ্ঠেতো মেরেছো লাথি — মারো দেখি পুরোভাগে! দেখি সেটা কেমন লাগে।"

সুধীর চক্রবর্তী দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্ববিরোধিতার, মর্যাদাবোধ এবং প্রভুভক্তির (এবং ভয়েরও) দোটানার বিবরণে উপনিবেশের চাকরিজীবী ভদ্রসাধারণের এক প্রতিনিধি-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয়তার আন্দোলনের ভেতরকার খাঁটি বস্তু এবং খাদ চিনিয়ে দেয়।

খাঁটি বস্তুটুকু তবু কোনো ভাবেই উপেক্ষার নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টির উজ্জ্বল অংশ ওই সব দোটানা ছাপিয়ে ওঠা অকৃত্রিম উদ্দীপনার ফসল — যা বাংলার চিরসম্পদ হয়ে আছে। উৎকর্ষের বিচারে স্বাদেশিক প্রেরণায় রচিত তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে গানকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়। লোকচিত্তে প্রভাব ব্যাপক হলেও তাঁর নাটকের তেমন শিল্পগৌরব নেই। গানে তাঁর সৃজন প্রতিভার মৌলিকতার পাশে নাটকগুলিকে এখন মনে হয় জোড়াতালি দেওয়া এক ধরনের কাঠামো যার মধ্যে দরকার মতো দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, এমন কী বিশ্বপ্রেম পুরে দেওয়া যায়। নাট্যশৈলী নিয়ে যে তাঁর নতুন কোনো ভাবনা ছিলনা, শিল্পগত দায়বোধ ছিলনা — সুধীর চক্রবর্তী এই সীমাবদ্ধতার দিকটি যথার্থ দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা যে গানেই উজ্জ্বল, একজন কম্পোজার হিসেবেই যে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল, এই ধারণাটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সুধীর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইদানীং গান নিয়ে বাংলায় প্রচুর লেখা আমরা পেয়েছি। তার বেশির ভাগই গানের কথার বা কাব্যগুণের স্বাদ নেওয়া। একে তো কবিতার সমালোচনাই বলা উচিত। সুধীর চক্রবর্তীর লেখায় সাংগীতিক রূপের বিশিষ্টতা বাণী এবং সুর একত্রিত মর্যাদা পায়। গানের কবিত্বের আলোচনা নয়, যথার্থত সংগীত রূপের আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ে তাঁর যাবতীয় অবলোকনের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব পাবে, স্থায়ী মূল্য পাবে, দ্বিজেন্দ্র গীতির মূল্য বিচারের অংশগুলি। এই বিশ্লেষণ আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। কোন্ গুণে দ্বিজেন্দ্রলালের গান লোকচিত্ত মাতিয়ে দেয়? শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল্য-গৌরব পায় কোন্ গুণে? ঐতিহাসিক ভাবে আধুনিক বাংলার গানে তাঁর স্থায়ী কীর্তি কী --- এই তিনটি বিবেচ্য সুধীর স্থিরভাবে মনে রেখেছেন। তাঁর বিচারদৃষ্টি বোঝার জন্য একটি দুটি জায়গা স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"-র চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল তথ্যের বিবরণের জন্য। সুধীর দেখাচ্ছেন, "সার্থক জনম আমার" ভাবনায় উচ্চতর হলেও সুর কঠিন মীড়বহুল এবং তালহীন হওয়ায়, চর্চাহীন সাধারণের গলায় ফুটবে না এমন-সব পর্দা থাকায় এ গান মুখে মুখে ফেরার সম্ভাবনাই ছিলনা। সম্মেলক কণ্ঠের উপযোগীও নয়। অন্য পক্ষে মধ্যসপ্তকে বোনা সুরের একতালা "বঙ্গ আমার" গানটিতে সহজেই সকলে গলা মেলাতে পারেন। (পৃ. ৬৫)।

কৃষ্ণনগরের বনেদি কালচারের প্রতিনিধি-পুরুষ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ছেলে দ্বিজেন্দ্রলালকে হিন্দুস্থানি সুর শেখান, আর সে-সুরে বাংলা গান বাঁধার দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার ভিতের উপরে কম্পোজার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। যেমন রবীন্দ্রনাথে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালেও হিন্দুস্থানি সুরে বাংলা কথা যোগ করা ছাড়িয়ে গানের বাণী অনুযায়ী সুরবিন্যাসের আলাদা আলাদা ধরন বড়ো হয়ে ওঠে। সুধীর দেখান, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মতো "খুব বেশি রাগমিশ্রণের মধ্যে না গিয়েও সাবলীলভাবে গানের মধ্যে রাগরূপের প্রাধান্য কমিয়ে একটা নতুন স্বরূপ এনেছেন ।" হতে পারে বিলিতি গানের মুভমেন্টের চমৎকার গতিভঙ্গি তাতে জুড়ে গেছে বলে। হতে পারে সুর দিয়ে বাণীর দীনতা ভরিয়েছেন বলে, কিংবা সুরের মায়া রয়ে গেছে ছন্দে। যাই হোক এটা ঠিক যে, "ধনধান্য পুষ্পভরা" গান শুনলে ঠিক কেদারা ঠাটের কথা মনে থাকেনা, "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" গান ভৈরবীকে ছাপিয়ে যায়, "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" গান শোনবার সময় খেয়ালই থাকেনা যে তার ভিত 'দেশ'-এর

(পৃ. ৯৯)। কম্পোজিশনের এই দক্ষতা ব্যাখ্যার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকে লেখক আর একটু গৌরব দিয়েছেন. "এ কাজটা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আগেই তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং করেছেন যোগ্যতরভাবে। কেননা প্রায়ই রাগমিশ্রণের পথে না গিয়ে তিনি একটা নির্দিষ্ট রাগের আশ্রয়ে চলেও গানকে তুলে ধরেছেন নিজের স্বভাবে"। (পৃ. ১০০)। এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এই লেখায় নেই। এটা একটি আলাদা প্রবন্ধের বিষয় হতে পারত।

হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর এই কীর্তি প্রায় হারিয়েই গেল চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মতো গাইয়ের অভাবে। মৌলিক সুরসৃষ্টি এবং গাইবার নিজস্ব ঢঙের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কেমন মাত করে দিতেন — তার স্মৃতি কিছু সুধীর চক্রবর্তী সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক যখন নিবিড় ছিল সেসব দিনে দুই কবির মিলিত গানের দৃশ্য অবিস্মরণীয়। " দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন — 'হোতে পাল্লেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন — 'তা বটেই তো, তা বটেই তো'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন — 'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্রনাথ গাহিতেন — 'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। (পৃ. ২৯, অতুল প্রসাদের স্মৃতিধৃত)।

হাসির গান প্রসঙ্গে এই রম্য আলোচনা থেকে আর একটি কথা মনে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিত্বেরই আর এক প্রতিফলন রয়েছে হাসির গানে। শুধুই কৌতুকে, শুধু মজায় তাঁর হাসির গান শেষ হয়ে যায়না. এক ধরনের জ্বালা এবং আক্ষেপ এবং কঠিন কটাক্ষ জেগে থাকে এইসব গানে। তাঁর সরল-মহৎ-উদার আদর্শের মাপে দেশবাসীর যাবতীয় সংকীর্ণতা, স্বীবিরোধ, বজ্জাতি তাঁকে ব্যথিত করত। সেই আহত অন্তঃকরণ হাসির গানে জ্বালা সঞ্চার করে দিত। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন, "এ কি হাসির গান? এ যে cruellest tragedy."

রবীন্দ্রনাথ বিলেত যান ১৭ বছর বয়সে. ১৮৭৮ সালে. দ্বিজেন্দ্রলাল যান ২১ বছর বয়সে, ১৮৮৪ সালে। প্রথম প্রথম দুজনেরই বিলিতি গান রুচত না, কিন্তু ক্রমে দুজনেই ওদেশের গানের গভীরে যান। শুধু ভালো করে শেখা নয়, ওদেশের সংগীত নিজেদের সৃজন প্রক্রিয়ায় উপাদান হিশেবে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে ফেরেন। "বাংলা গানে বিলাতি চাল" পরিচ্ছেদে সুধীর চক্রবর্তী আইরিশ-স্কচ-ইংরেজি গান ভেঙে বাংলা গান রচনায় এই দুই কম্পোজারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেসব গান দুজনে ভেঙে নতুন সৃষ্টি করেছেন, তার মূল রূপগুলি সব পাওয়া সহজ নয়, সেদিক থেকে এই খুঁটিয়ে দেখা যোগ্য বিশ্লেষণটিকেও সম্পূর্ণ বলা যাবেনা। কিন্তু দুই প্রতিভার প্রবণতা বোঝার একটি স্থির দৃষ্টি সুধীর ধরিয়ে দিয়েছেন।

এই কথাটা বেরিয়ে আসে যে দ্বিজেন্দ্রলাল মূল গানের কাঠামোটি, সুর ও ছন্দ অটুট রেখে বাংলা গান বাঁধতেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন কথাটা বড়ো একটা মানেন নি, তাঁর পক্ষে বিদেশি ভাঙা ছিল সেই বয়সের আত্মপ্রকাশের এক তাৎক্ষণিক অবলম্বন মাত্র, অচিরেই তিনি খুঁজে নেবেন তাঁর নিজস্ব "বন্দিশ, যা ভারতীয় মার্গ সংগীত, বিলাতি গান ও বাংলা লোকায়ত গানের ত্রিধা সমন্বয়ের উৎসার এক মৌলিক গীতরীতি"। (পৃ. ১৪১)। দ্বিজেন্দ্রলাল, ভিন্নভাবে, নিজের গানে বৈচিত্র্য-উচ্ছলতা-সুরের দোলার উপাদান হিশেবে মূল বিলিতি গানের ঢঙ নিজের গানের শৈলীতে সংগত করে নিতে পেরেছিলেন। অনেকটাই প্রকট এবং প্রকাশ্যভাবে এই উপাদান তাঁর গানে থেকে গেছে এবং একে তিনি সচেতন ব্যবহারে আমাদের সংগীত-সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে সেভাবে বিলিতি গানের প্রকট প্রভাব নেই, যেটুকু রয়েছে তা অন্তর্লীন। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য সুধীর চক্রবর্তী অনুরাধা পালচৌধুরীর 'বিলাতী গানভাঙা রবীন্দ্রসংগীত' বইখানির উল্লেখ করেছেন।

'বন্দেমাতরম্' গান সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, "... আমাদের প্রধান স্বদেশী সংগীত বন্দেমাতরম্ বাণীগত রচনাশৈলীর দিক থেকে জোড়কলম। এ ভাষা শিষ্ট সংস্কৃত ও সরল বাংলা। ফলে 'দ্বিসপ্ত-কোটিকণ্ঠভুজৈর্ধৃত খরকরবালে' এবং 'অবলা কেন মা এত বলে' এমন বিরুদ্ধ গীতিবাণী পাশাপাশি রয়ে গেছে। এর রচনাগত দুর্বলতা আজ পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি কেন কে জানে?" (পৃ. ৮১)। তা কেন? ও গান যেদিন প্রথম শোনানো হয় সেদিন যে কারোই ভালো লাগেনি সেকথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন: "যেদিন তাঁহার দরবারে বসিয়া সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম্ গান শুনিলাম, গানটি কাহারো মনে ধরিল না। একজন বলিলেন, 'অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে' — 'শস্যশ্যামলাং' শ্রুতিকটু নয় তো কী? 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' — ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না। একজন বলিলেন — 'কে বলে মা তুমি অবলে' অবলের এ-কার না ব্যাকরণ, না-কিছু।' বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি একঘণ্টা ধরিয়া ধীরভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'আমার ভালো লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছে হয় পড়ো, না-হয় ফেলে দাও, না-হয় পড়ো না।' শ্রুতিকটু দোষ, ব্যাকরণ দোষ থাকিলেও 'বন্দেমাতরম্' সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমেরই জয় হইয়াছে।" ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২)।

বাংলা কবিতায় কি দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন? কাব্যের ভাষায় কোনো-না-কোনো ভাবে আভরণ থাকবেই — আমাদের এই অভ্যাস মধুসূদনের সময় থেকেই পাকা হয়ে আছে। গদ্যের এলাকায় কবিতার খানিকটা

অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পরীক্ষায় হাত দিয়েও রবীন্দ্রনাথ আভরণহীন সাদা গদ্যে কোনো গদ্যকবিতা লেখেন নি। 'আষাঢ়ে' বইখানির সমালোচনায় ('ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ছন্দ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। সে আপত্তি ওই চিরাচরিত অভ্যাস থেকেই আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে।" পর্বের মাপ অসমান হয়ে পড়লেই এই বাধা জন্মায়। সেটা কবি ইচ্ছে করেই করতেন। উদ্দেশ্য, পদ্যকে মুখের ভাষার চালে চালানো। পরে কবিতার আঙ্গিকের এই কারুকর্ম নিয়ে রাশি রাশি তর্ক হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এসব তর্ক শুরু হবার অনেক অনেক আগে যে দৃষ্টান্ত রচনা করে গেছেন তা একালেও খুব দুঃসাহসের কাজ মনে হয়। এ কৃতিত্ব ছাড়াও সে সময়ের পটে তাঁর কবিতার অনন্যতা আমাদের কবিতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রোমান্টিক বিশ্বদৃষ্টির জাগরণ এবং বিকাশ যখন মূল প্রবণতা, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের না-রোমান্টিক মেজাজ বড়ো রকমের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই। তাঁর কবিতার এই চরিত্র বিশদ আলোচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুধীর চক্রবর্তী। এবং এও দেখিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের মেজাজে যে বিশিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ কবিত্বের বীজ ছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। কবিতা বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্বচেতনার বা কাব্যপ্রত্যয়ের শিরদাঁড়া পেলেন না শেষ অবধি এবং কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন। সে তুলনায় শিল্পমূল্যে খুব গৌরবের বস্তু না হয়ে উঠলেও নাটকে তিনি নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় সমকালীন স্বদেশের কিছু যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। বিশেষ উল্লেখেরই বিষয় যে, নাটকের গানে তিনি বড়ো মাপের সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। (পৃ. ১২১)। আমাদের অর্বাচীন নাটকের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশৈলী আলাদা করে চিনে নেওয়াও যায়। এই মাধ্যমটি আশ্রয় করে যে তিনি দেশের চিত্ত অনেক দূর অবধি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন বড়গাছিয়া গ্রামের সেই কিশোরদের অভিনয় তারই নজির।

সুধীর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ, পুস্তক বিপণি।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৮৯।

বিষ্ণু দে-চর্চা

বিষ্ণু দে-চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল 'চোরাবালি'র উপরে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর নিবন্ধটিতে। সেই নিবন্ধ তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'কাব্যের মুক্তি'র পাশে রেখে পড়লে কবিতার কালান্তর ও আধুনিক কবির সমস্যা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দে-র দায়িত্ববান কবিচরিত্রের মূল লক্ষণগুলি যে-কোনো উৎসুক পাঠকের বোধে স্বচ্ছ হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ খুব বেশি পাঠকের অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন মনে হয়না, না হলে বিষ্ণু দে-র কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এবং বিরূপ সমালোচনার প্রতিপত্তি অত প্রবল হয় কী করে। এমন কী অকৃত্রিম কবিতাপ্রেমিক বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র কবিতার দুরূহতা নিয়ে অনুযোগ সাজিয়ে কর্তব্য সমাপন করেন, "নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে" কবিতা না লেখার ব্যাপারটা তাঁর মনে হয় — হেঁয়ালি। আসলে কল্লোলীয় ছদ্ম-আধুনিকতার সোরগোলের মধ্যে কবিতার ঐতিহ্য-বিপ্লবে আধুনিক কবির কঠিন দায়িত্বের চেতনা স্ফুরিত হবার তেমন সুযোগ পায়নি — আজ স্থির বিচারে এটা ধরা যাচ্ছে। এই দায়িত্বচেতনার দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথের আশ্চর্য উক্তিটি আজও স্মরণীয়,

"কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয়; সে গাছ পর্বতজাত রডোডেন্ড্রনের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত; এবং সেই জন্যে তার দেহ শ্রীশৃঙ্খল, তার পরিসর খর্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখায়, আছে শুধু একটা অহৈতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নির্মম, রক্তাক্ত ফুল।" ("কাব্যের মুক্তি", 'স্বগত' ১৩৬৪ ব)।

এই বিবরণ যে-তাৎপর্যে য়ুরোপীয় আধুনিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, ঠিক সেই তাৎপর্যেই বাংলা কবিতা সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে কিনা — এ সংশয় জাগতে পারে। য়ুরোপীয় আধুনিকতার সংকট আর আমাদের আধুনিকতার সমস্যা নিশ্চয়ই এক নয়। বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রভাব য়ুরোপীয় মনকে যেমন সাক্ষাৎভাবে দীর্ণ করে, আমাদের মানসে সেই সাক্ষাৎ চাপ আসা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত জাগরণের সংকীর্ণ জগৎটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে আত্মগৌরবের উঁচু জমিতে অধিষ্ঠিত ছিল — সে জমিতে যুদ্ধোত্তর পর্বেই ধস নামে। সমাজে মধ্যবিত্তের নেতৃ-ভূমিকা শেষ হয়ে আসে। মধ্যবিত্তের বিকাশ অবরুদ্ধ হওয়া অনিবার্য — এই বোধ সচেতন বা অচেতনভাবে বিষাদ-নৈরাশ্যের ছায়া বিস্তার করে। অন্য দিকে এই শ্রেণীরই সচেতন এক অংশ নিজেদের শ্রেণীগত পরিসীমার বাইরে শ্রমজীবী জনতার ঐকাত্ম্য খোঁজে। মধ্যবিত্ত

শ্রেণীমানসের এই দুই প্রবণতা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান দুই ধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিত উপেক্ষা করলে বাংলা কবিতার আধুনিকতার আলোচনা নিরালম্ব হয়ে পড়ে। এদিক থেকে বিমলচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধগুলি আমাদের আবার দেখা উচিত। আজ থেকে ৩৩-৩৪ বছর আগে তিনি মধ্যবিত্তের সংকটের কার্যকারণ সন্ধান করেছিলেন এবং যুদ্ধোত্তর বাংলার সামাজিক পটভূমিতে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে, বিশেষত বিষ্ণু দে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। বিমলচন্দ্রের বই হাতে পাওয়া এখন সহজ নয়, তাই তাঁর দু-একটি উক্তি এখানে তুলে দিই,

"সমরোত্তর যুগের দোহাইটা আমাদের পক্ষেও একেবারে নকল, সুতরাং বাজে নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসে যে সংকট ক্রমবর্ধমান এবং বর্তমান সামাজিক বিবর্তন সেই ক্রমবর্ধমান সংকটকে যে ভাবে গভীরতর করে তুলছে তাতে কাব্যে নতুন ভঙ্গী আসা একান্ত স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত যে শ্রেণী আমাদের সমাজ-বিবর্তনের পুরোভাগে চলেছে তার মধ্যে ফাটল ধরল, সম্প্রসারণের পরিবর্তে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। · দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী মন্দার ছায়া পড়ল। ভাঙন আরও বাড়ল, সংঘাত তীব্রতর হল। একদিকে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার এবং অন্যদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্ম হতে প্রমাণ হয় বর্তমান সমাজব্যবস্থা এদেশেও যেমন একদিকে অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি এই মৃত্যু তরঙ্গিনীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে নতুন তটভূমি জেগে উঠছে, সেখানে নতুন ফসল ফলে —এই প্রদোষ-অন্ধকারের পিছনে নতুন উষার অরুণিমার সন্ধান মিলছে। কবিতার পক্ষে এর গুরুত্ব অসাধারণ।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিমলচন্দ্র বিষ্ণু দে সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

"বিষ্ণু দে-র কাব্য নানা দিক্ দিয়ে বিস্ময়কর। এ পর্যায়ের কবিদের মধ্যে তিনি-ই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ, কেননা শুধু কবিকর্মেই তাঁর উচিত অধিকার নেই, কবি-ধর্মও এঁর মধ্যে সম্ভবত বর্ধমান।

"...প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন 'চোরাবালি'-র অবিশ্বাস হতে 'বাইশে জুনের' বিশ্বাসের যাত্রাপথে 'পূর্বলেখ'-র এই গম্ভীর বিষন্নতার প্রয়োজন ছিল। আর এ কথাও স্বীকার করতে হয়, 'বাইশে জুনে' ওরকম বিশ্বাস সম্ভব হয়েছে কবি একটি সমন্বয় খুঁজে পাওয়ার ফলেই, যে সমন্বয় যদি ইতিহাসের ধারাতে ব্যর্থও হয় কাব্যরচনার জন্য নিশ্চয়ই ব্যর্থ নয়, সার্থকই।" ('সমাজ ও সাহিত্য', পৃ. ১৭২-৭৩, ১৯৫, ২১০)

আরও স্মরণ হয় ১৩৬৬-র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য পত্র'য় অশোক সেনের দীর্ঘ দুটি প্রবন্ধের কথা, যাতে 'অন্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্থ অবধি বিষ্ণু দে-র নৈর্ব্যক্তিক বিষয়লগ্ন দৃষ্টিকোণ বিকাশের স্তরগুলি এবং মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার

তাঁর উদ্ধরণ তিনি কবিতা ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে 'কবিতা', 'সাহিত্যপত্র' ও 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রিভিউগুলিও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যেমন ভিন্ন তাৎপর্যে স্মরণীয় শঙ্খ ঘোষের "বন্দরে ছন্দের দুর্গে" প্রবন্ধটির কথা।

বিভিন্ন চর্চায় যুক্ত হল সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে' বইটি। ১. "বিষ্ণু দে-র কাব্যপাঠের ভূমিকা", ২. "বিষ্ণু দে ও সময়", ৩. "বিষ্ণু দে ও পুরাণ", ৪. "ঘোড়সওয়ার : ঘোড়া নদী", ৫. "একালে ক্রেসিডা-ট্রয়লাস", ৬. "পদধ্বনি", ৭. "এলসিনোরে ও জল দাও", ৮. "বিষ্ণু দে ও এলিয়ট", ৯. "বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তা", ১০. "বিভাবরী ত কে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা" — এই দশটি প্রবন্ধ এবং সপ্তম প্রবন্ধের পরিশিষ্ট হিসেবে "বাংলার এলিয়ট : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত" নামে একটি স্বতন্ত্র লেখা নিয়ে বইখানি এগারটি প্রবন্ধের সংকলন।

বিষ্ণু দে-র কবিত্বের আবহমণ্ডল পরিচিত করিয়ে দেবার দিক থেকে "বিষ্ণু দে ও সময়", "বিষ্ণু দে ও এলিয়ট", "বিষ্ণু দে ও পুরাণ" এবং "বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তা" প্রবন্ধ চারটি গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণু দে-র সময় চেতনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেখক বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ও বিপর্যয়ের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী লেখকদের সূত্রগুলির স্পষ্টতর সম্প্রসারণ। কিন্তু নতুন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় অবক্ষয়গ্রস্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভেতর থেকে জাত সাম্যবাদী নেতৃত্বের আপন শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা কাটানোর চেষ্টা ও পর্যায়ানুক্রমিক ব্যর্থতার উল্লেখে। যথার্থ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে শ্রেণী-পরিসীমা উত্তীর্ণ হয়ে ব্যাপক জনজীবনের সঙ্গে সর্বাঙ্গবর্তিতার সম্পর্ক রচনার যোগ্য অভ্রান্ত সংকল্প আজও অনায়ত্ত রয়ে গেছে। মুক্তির এই অনন্য উপায়টি ফলবান করে তোলার ব্যর্থতা মধ্যবিত্তের শ্রেণীমানসে উদাসীন হতাশা নয়, তীব্র ট্র্যাজিডিরই বোধ জাগায়। সঙ্গত ভাবেই লেখক এই "সামগ্রিক ভাঙন"-এর বা বিশৃঙ্খলার পট তাঁর আলোচনায় আনেন, কারণ, নিজের কালের বিশৃঙ্খলা এবং সংকল্পচ্যুতি এবং ক্লান্তাগারের ছত্রাকার অভিজ্ঞতা বিষ্ণু দে-র মানস বিকাশের স্তরে স্তরে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। তিনি বুঝেছিলেন, অব্যবস্থিত বর্তমানের কাছে আত্মসমর্পণে কবিত্বের মুক্তি সম্ভব নয়, প্রয়োজন পরিবেশের উপরে কর্তৃত্ব অর্জন। ফলত সাক্ষাৎ বর্তমানের তাৎপর্য আত্তীকরণের আগ্রহে তিনি স্মৃতিধৃত অতীত আর "সম্পূর্ণ শাখায় পাতায় ফুলে ফলে দীপ্ত দান্ত" সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে একত্রিত সংকল্পে ধারণ করতে চেয়েছেন। তাঁর কালচেতনা খণ্ডিত বোধের পরিসীমা পেরিয়ে ত্রিকালের দ্বন্দ্বাত্মক ঐক্যে উত্তীর্ণ হতে চায়, নিরাসক্ত আকাঙ্ক্ষায় "প্রত্যক্ষের একটি কলিতে" ত্রিকালকে মেলাতে চান। এই বোধের পরিশীলনে তিনি এলিয়টের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন। তাকে 'এলিয়টপন্থী'

বলার কোনো মানে নেই, কারণ, সমগ্র এলিয়টকে কখনওই তিনি গ্রাহ্য মনে করেন নি। এলিয়টকে প্রয়োজনীয় ভাবে ব্যবহার করেছেন, মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিক্‌সের দৃষ্টিতে তিনি এলিয়টের ব্যক্তিবাদী নিরালম্বতার বিপদ এড়িয়ে ঐ আধুনিক মহাকবির নৈর্ব্যক্তিক কাব্যাদর্শে ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে বিশ্বের সেতু রচনার উপায় পান এবং তাঁরই শিক্ষায় ঐতিহ্যকে পেতে চান "নিত্যনব সাক্ষাৎ নির্মাণে"। বিষ্ণু দে-র সময়চেতনার প্রসঙ্গ স্পষ্টতর হয় "বিষ্ণু দে ও এলিয়ট" প্রবন্ধটি একত্র পাঠে এবং এই সূত্রে পরিশিষ্ট হিশাবে মুদ্রিত 'বাঙলায় এলিয়ট : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' প্রবন্ধটিও প্রাসঙ্গিক। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে সুধীন্দ্রনাথের সামাজিক দায়বন্ধতা-বর্জিত কবিত্বের ঝোঁক সজ্ঞান গ্রহণবর্জনের পদ্ধতিতে অর্জিত ঐতিহ্যের জমি থেকে তাঁকে সামাজিক তাৎপর্যরিক্ত মনোবিদ্যার প্রতীকতত্ত্বে নিয়ে যায়, অন্যপক্ষে বিষ্ণু দে এলিয়টের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ধাপটুকু পেরিয়ে পৌঁছন মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার বাঞ্ছিত শৃঙ্খলতা।। বিষ্ণু দে-কে বুঝতে এ-তুলনা সাহায্য করে যদিও, তবু, সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই বিচার চূড়ান্ত মনে করা যায়না। সুধীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্বের তৎপর্য তাঁর কবিতার সামগ্রিক বিচারেই স্পষ্ট হতে পারে. প্রবন্ধের সাক্ষ্য বোধহয় সুধীন্দ্রনাথকে সঠিকভাবে চিনতে পূর্ণত সাহায্য করেনা।

প্রত্ন-প্রতিমা বা archetype-এর বহুল ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর চৈতন্যে প্রতিভাত সমকালীন বাস্তবতার মর্ম প্রকাশের জন্যে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন পুরাণের মাতৃ-মৃত্তিকা থেকে। "বিষ্ণু দে ও পুরাণ" প্রবন্ধে লেখক যথার্থত বলেছেন, "বিষ্ণু দে-র মিথের সেই দিকটির প্রতিই মনোযোগ বেশি, যে-দিকটি ইতিহাসের নানা যুগে নানা কবির কল্পনার ঐশ্বর্যে নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।" লক্ষণীয়, তাঁর প্রসৃত চৈতন্য শুধু স্বজাতীয় পুরাণ নয়, দূর ইন্দো-য়ুরোপীয় পৌরাণিক জগতটিতেও আশ্রয় পায়। অন্যদিকে তিনি সঞ্জীবিত করেন লোকপুরাণের বিশিষ্ট উপাদানগুলি। য়ুরোপীয় এবং স্বদেশীয় কাব্যসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আসা পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলির ভাবানুষঙ্গে যে মানবিক রিক্‌থ সংলগ্ন রয়ে গেছে, বিষ্ণু দে প্রসঙ্গগুলিকে আপন যুগরূপের ছাঁচে সম্ন্যস্ত করে সেই আবহমান আবিশ্ব মানবিক রিক্‌থকে তাৎপর্যের নতুন স্তরে উত্তীর্ণ করেন। একালের জিজ্ঞাসু পাঠক তাঁর কবিতার প্রত্নপ্রতিমার চরিত্রে নিজেরই জটিল অস্তিত্বের প্রতিরূপ খুঁজে পায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাগুলির পুর্বতন ভাবানুষঙ্গের প্রভাবে আধুনিক জটিলতার তাৎপর্য স্বচ্ছ হয় মানব-বিকাশের স্তর-পরম্পরার ব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিতের আভাসে। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রধান কবিতাগুলির বুনানি আলগা করে করে কবির সংশ্লেষণ নৈপুণ্য, সংকল্পের বিষয়াধার গড়ার নৈপুণ্য বিষয়ে যোগ্য আলোচনা করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য, কবিতার নিজেকে

প্রকাশ করা ছাড়াও বাংলায় এবং ইংরেজিতে বিষ্ণু দে প্রচুর সমালোচনা লিখেছেন। শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতির অনাবিধ প্রান্তগুলি তাঁর সজাগ মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সর্বত্রই সুস্থির তত্ত্বগত অবস্থান থেকে তিনি কথা বলেন। তাঁর কবিত্বেরও নির্ভর নিশ্চয় একই তত্ত্বভিত্তির উপরে। সমগ্র 'বিষ্ণু দে' বুঝবার পক্ষে এই বর্ষীয়ান কবির সারাজীবনের কাজকর্মের ধারক তত্ত্বভিত্তি অনুসন্ধান তাই সমূহ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিল্পসাহিত্যের অন্তর্গত নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার বিকাশ ও বিকাশের পারম্পর্য বিষয়ে সামান্যই আলোচনা হয়েছে। অপেক্ষিত সেই আলোচনায় শ-দেড়েক বৎসরে গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্যের অভ্যন্তর-কাঠামো এবং সে কাঠামোর নতুন অভিযোজনগুলি স্পষ্ট হতে পারে। সে অনেক শ্রম এবং অভিনিবেশ-সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু বিশেষ কোনো কবির তত্ত্বাংশ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর সব রকমের লেখার সাহায্য নেবার বাধ্যবাধকতা বোধহয় এড়ানো যায়না। "বিষ্ণু দে-র নন্দনচিন্তা" প্রবন্ধে প্রত্যাশিত সেই পরিশ্রমের পরিচয় পেলাম না। এ-প্রবন্ধে বিষ্ণু-দের অবলোকনের মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখার উদ্ধৃতি সাজিয়ে খুবই উপর উপর ধরার চেষ্টা আছে, কিন্তু চলমান এক দীর্ঘ কালপর্বে কবির দৃষ্টি কীভাবে ব্যাপ্তি ও শুদ্ধতা অর্জন করেছে, তাঁর ব্যক্তিগত নন্দনতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে কীভাবে — এ আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়না। এদিক থেকে ১৩৭৯-এর শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্যপত্র'য় অরুণ সেন-এর 'কবির নন্দন জিজ্ঞাসা' এখন পর্যন্ত এ-বিষয়ে পূর্ণতর লেখা।

মনে পড়ে বছর পঁচিশ আগেকার কথা: বিমুখ বন্ধুদের মনে আকর্ষণ জাগাবার জন্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু দে-র কবিতা সুযোগ পেলেই আবৃত্তি করতেন, বিতর্ক চালাতেন ক্লান্তিহীনভাবে। কবিতা লেখা ছেড়ে কবিতার সমালোচনায় হাত দেবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে সম্পর্কেই তিনি বেশি লিখেছেন। "বিষ্ণু দে-র কাব্যপাঠের ভূমিকা" নামের একটি লেখার সঙ্গে তাঁর আরও পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই বইটিতে সংকলিত হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, চিত্রকল্প ও প্রতীক ধরে কবিতার মর্মে যাওয়ার আলোচনা-পদ্ধতি বাংলা সমালোচনায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল — এখন এই পদ্ধতি আমাদের কবিতা সমালোচনায় প্রতিষ্ঠিত। এ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ কবিতার নিবিষ্ট বিচার গুরুত্ব পায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণু দে-র বিকাশের পর্বগুলির প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা নির্বাচন করেছেন এবং সেইসব কবিতার চিত্রকল্প ও প্রতীকের বহিরাবরণ মোচন করে এক-একটি কালপর্বে কবির দেশ-কাল অবলোকনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনায় যান্ত্রিক ব্যবচ্ছেদ প্রবণতা কোথাও প্রশ্রয় পায়নি, বিশেষ কবিতা তিনি যেভাবে উপভোগ করছেন তার ছায়া প্রতিফলন আলোচনার মধ্যে অন্তরঙ্গ আলাপের স্বাদ

এনে দিয়েছে। সমালোচনার সঙ্গে সমালোচকের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পাওয়া একটা উপরি লাভ। সর্বত্র সব মতামত মেনে নিতে না পারলেও এই সান্নিধ্য পাঠকের বোধ-চৈতন্যকে উদ্দীপিত করে, সমালোচিত কবিতাগুলির দিকে নতুনভাবে মন দিতে হয় তার ফলে।

সরোজবাবু এক জায়গায় বলেছেন, "ধীরে ধীরে দেখা গেল বিষ্ণু দে-র সমস্ত কবিতা একটিই কবিতা।" কোনো একটি পর্যায়ের তীব্র প্রকাশ-রূপে বিষ্ণু দে কখনও থমকে যাননি। সেই চূড়া থেকে আবার বিস্তারের দিকে গেছেন। সরোজবাবু চূড়াস্পর্শী কবিতাগুলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট, তাই তিনি আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন "ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা', 'পদধ্বনি', 'এলসিনোরে' বা 'জল দাও'-এর মতো কবিতা। আলোচনা প্রসঙ্গে আপেক্ষিকভাবে গৌণ কবিতার অনেক উজ্জ্বল অংশ ব্যবহার করেছেন। তবুও লেখা কটি পরস্পর সংলগ্ন -- এমন বলা যায়না। বইটিতে বিচ্ছিন্ন লেখা সংকলনের ধাঁচ রয়ে গেছে। কোনো পূর্ণতর পরিকল্পনায় বিষ্ণু দে-র আনুপূর্বিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনার শ্রমসাধ্য দায়িত্ব এঁরা কখনও পালন করবেন — আশা রাখা যাক।

কোনো কোনো লেখায়, বিশেষ করে 'ঘোড়সওয়ার' সম্পর্কে আলোচনায় কবি ও কবিপত্নীর কাছ থেকে পাওয়া কিছু আকর্ষণীয় তথ্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন। "কবি রিউম্যাটিক ফিভারে শয্যাগত ; আগের রাত্রি কেটেছে প্রবল জ্বরে, ডিলিরিয়মে। ভোরের দিকে তিনি কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থাতেই কাগজ-কলম চাইলেন। কাগজ-কলম পেয়ে এক ঝোঁকে তিনি ঘোড়সওয়ার কবিতাটির প্রথমার্ধ লেখেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম থেকে জেগে বাকি অর্ধ শেষ করেন। আচ্ছন্ন অর্ধ-চেতন মন থেকে একটি সংহত কবিতা উৎসারিত হয়েছিল জানার পরে কবিতাটির আদ্যন্ত জুড়ে যে টেনশন অনুভূত হয় তার কারণ সম্পর্কে নিশ্চয়ই পাঠককে নতুন করে ভাবতে হবে। বইটিতে এমন আরও কিছু আনকোরা তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। 'ঘোড়সওয়ার' সম্পর্কে সরোজবাবুর এই নতুন লেখাটি থেকে গভীরতর উপলব্ধিতে যাবার মতো আলো পাওয়া যায়। শুধু খটকা লাগে দু-একটি মন্তব্যে। "ব্যক্তির পূর্ণায়নের জন্য ব্যক্তিত্বের আকুলতা" (৫৫ পৃ.) কেন ? "ব্যক্তিত্বের পূর্ণায়নের জন্য ব্যক্তির আকুলতা"-ই তো উদ্দিষ্ট বক্তব্য এখানে ? "চাঁদের আলোয় চাচর বালির চড়া" পঙক্তিটিতে কি "একটা চটচটে মাদকতার" ভাব ফোটে সত্যিই। শুকনো কুঞ্চিত বালিতে চটচটে ভাব আসবে কী করে। রম্য অথচ বিশুষ্ক ঊষরতা ভিন্ন আর-কোনো অর্থ বোধহয় পঙক্তিটি থেকে পাওয়া যায়না।

এমন সব গৌণ আপত্তি ছেড়ে দিয়ে বলব, আমাদের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি সম্পর্কে একখানি গোটা বই — ছোটো হলেও — সাগ্রহে হাতে তুলে নিতে

হয়। এই কাজটির জন্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা-অনুরাগীদের ধন্যবাদভাজন হয়ে রইলেন।

আবার কখনও নতুন সংস্করণ হলে ছাপার ব্যাপারে এবং সাজানো গোছানোর ব্যাপারে লেখকদের আর একটু মনোযোগী হতে অনুরোধ করি। তাছাড়া বই-এর নামকরণে 'কোমলে গান্ধারে' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে? 'গা' স্বরের কোমল বোঝাতে 'কোমল গান্ধার' হয়, কিন্তু 'কোমলে গান্ধারে' অর্থাৎ কোমলে ও গান্ধারে বললে কী বুঝব? বিষ্ণু দে-র একটি কবিতায় এই প্রয়োগ রয়েছে :

> চাই বয়সানুসারে আর সম্বন্ধ-যাথার্থ্যে সমতাই,
> নানা কোমলে গান্ধারে কিংবা নানা নিষাদে মধ্যমে নানা
> ক্ষেত নদী পাহাড় মাটিতে সংলগ্নতা, জানা বা অজানা
> নানান রচনা, কেন ভাবা শুধু শত্রু কিংবা ভাই ভাই?
> ("জীবনের ঘরে নেই"./'রবি করোজ্জ্বল নিজদেশে')

তবুও এরকম প্রয়োগের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, কোমলে গান্ধারে বিষ্ণু দে, রমা পাবলিকেশন। মৌসুমী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় মুদ্রণে বইখানির নাম 'বিষ্ণু দে : কালে কালোত্তরে' (১৯৮২)।

পরিচয়
সমালোচনা সংখ্যা : ৩৮৩ ব.
মার্চ-মে : ১৯৭৭

সুকুমার সেন
মনীষার আধুনিক চারিত্র

৯২ বছর বয়সে কেউ চলে গেলে শোচনার কিছু থাকেনা। এ তো যাবারই বয়স। সকলেরই মন সে বিয়োগ মেনে নেবার জন্যে তৈরিও থাকে। কিন্তু সুকুমার সেন মশায়ের চলে যাওয়া মেনে নেওয়া তবু অনেকের পক্ষেই সহজ হয় নি। মানববিদ্যার কোনো বিষয় নিয়ে যাঁরাই কিছু কাজকর্ম করেন তাঁদের কাছে তিনি শেষ ভরসা ছিলেন। তাঁদের অভ্যাসের মধ্যে একটা নিশ্চয়-বোধ স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল, নিতান্ত ঠেকে গেলে একবার স্যারের কাছে যাওয়া মানেই কিছু-না-কিছু দিশা পাওয়া সুনিশ্চিত। বকাঝকা ছিল। "কী কী দেখেছেন বলুন। এটাও দেখেন নি? অপনাদের কী হবে!" এসব শুনতেই হত। খুবই প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত মানুষকেও শুনতে হয়েছে, "বৃথাই আপনার পিতৃদেব আপনাকে লেখাপড়া শেখাতে টাকা খরচ করেছিলেন।" কিন্তু এই বকুনির ঝাঁজ সহজেই কেটেও যেত। বিষয়ের মধ্যে চলে যেতেন। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গটির সূত্র ধরে চলে যেতেন অনেক বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে। নানা দিক থেকে আলো ফেলতেন ছোটো প্রসঙ্গেরও উপরে। চর্চার এই ব্যাপ্তি এবং মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে পরস্পর যোগ সম্পর্কে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বোধ জিজ্ঞাসুকে বিস্মিত করে দিত। আমাদের অভিজ্ঞতায় মননের এই উজ্জ্বলতা দেখেছি এক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে, আর সুকুমার সেনের মধ্যে। বড়ো মাপের পণ্ডিত মানুষ বাংলার বিদ্যাচর্চার জগতে আরও এসেছেন। প্রয়োজনে তাঁদের কাছ থেকে বিষয়-বিশেষের তত্ত্ব-তথ্য আহরণ করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো বিষয়কে সংস্কৃতির বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে অমনভাবে দেখার, মানব-বিকাশের সকল আয়তনে অমন অনায়াসে বিচরণের সাধ্য আমাদের প্রজন্মে এই দুই মনস্বী ভিন্ন আর কারও মধ্যে দেখিনি। সুনীতিকুমার নেই, সুকুমার সেনও গেলেন। এ শূন্যতা আবার ভরে উঠবে — এমন আশ্বাস আপাতত কোথাও নেই। যেন-বা প্রাচীন কোনো বিরাট গাছ হঠাৎই উপড়ে পড়ে গেল। বিদ্যাজীবী বহু জিজ্ঞাসুর দীর্ঘ দিনের এক নিশ্চিত আশ্রয় ভেঙে গেল। ৯২-এও চলে যাবেন — এ বাস্তবকে মন মানতে চায় না।

২

অনেক দিন আগের কথা। বাংলা ১৩৩৭ সন। একটানা পাঁচ বছর বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্বের অবসানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩৬-তম বার্ষিক

অধিবেশনে শেষ সভাপতির অভিভাষণ দিচ্ছেন। কথায় কথায় খুব গৌরব করে একদল তরুণ লেখকের কথা বললেন। সুনীতিকুমারের প্রশংসা করতে গিয়ে উল্লেখ করলেন, "সুনীতিকুমার দুই-একটি ভালো চেলা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীমান্ সুকুমার সেন একটি। তিনি আমাদের শব্দ-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ দিয়াছেন।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ-দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬১)। এই বোধ হয় সুকুমার সেনের মনস্বিতার প্রথম প্রকাশ্য স্বীকৃতি। মেধাবী চেলাটিকে সুনীতিকুমার বরাবর নানা দিকে চালিয়ে দিতেন। শব্দশাস্ত্রের ছাত্রকে পুরানো সাহিত্যের আলোচনায় উৎসাহ দেবার প্রথম নজিরটি সুকুমার সেন খুব স্মরণ করতেন। সুনীতিবাবুর বাড়িতে একদিন দেখেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক একখানি বই উপহার দিতে এসেছেন। তিনি চলে গেলে সুনীতিবাবু বললেন, ইনি নগেন্দ্রনাথ বসু। গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙালি নন, মৈথিলি কবি, প্রমাণ করতে এই বই লিখেছেন। দারভাঙার মহারাজ অনেক খরচ করে বইখানি ছাপিয়ে দিয়েছেন। সুকুমার সেন আপত্তি করে বলেন, তা কী করে হবে। গোবিন্দদাসের মা বাবা সব যে বাঙালি। তাতে সুনীতিবাবু বলেন, তাহলে এই বই সম্পর্কে আপনিই লিখুন। লেখা হল "গোবিন্দদাস কবিরাজ" — দীর্ঘ প্রবন্ধ। ৩৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার একটি সংখ্যা জুড়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। সুকুমার সেন বলেন, এই লেখার সূত্রেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়ে তোলার দিকে তাঁর মন যায়। এ কাজ, বা তাঁর জীবনের কোনো কাজকেই তিনি ধরাবাঁধা গবেষণা বলতেন না। যখন যা নাগালে এসেছে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাঁর খুঁটিনাটি মনে জমিয়ে রেখেছেন। উপলক্ষ এলে একটা বিষয়-এর সূত্রে সেই সঞ্চয় কাজে লাগিয়ে তন্ন-তন্ন বিষয়টির পুরো অবয়ব তৈরি করে তুলেছেন। গোবিন্দদাস বিষয়ে জিজ্ঞাসা তাঁকে গোটা ব্রজবুলি সাহিত্যের চর্চায় টেনে নেয়। লেখা হয় *A History of Brajabuli Literature*. (১৯৩৫)। বাংলার বৈষ্ণব কবি এবং বৈষ্ণব পদাবলীর উপরে প্রামাণিক এই কাজটির পাশাপাশি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দাঁড় করাবার উদ্যোগ ধারাবাহিক চলে এসেছে।

শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টাদের প্রতিভার মর্মে থাকে সৃজনের গরজ। মননজীবী মনস্বীদের মধ্যেও কি এক ধরনের সৃজনধর্ম কাজ করে না? সুকুমার সেনের মতো মানুষের কাছে এলে এ কথা মনে আসবেই। নিজেকে গড়ে তোলার দিনগুলির কথা বলতেন যখন, মনে করিয়ে দিতেন — কেমন করে নিজের গরজে ৪০ পেরোনোর আগেই প্রতিষ্ঠার নতুন নতুন ভিত তিনি স্থাপনা করে এগিয়ে ছিলেন, তখন মনে হত — এও এক ধরনের সৃজনধর্মিতা। মননের সৃজনধর্ম তাঁকে সংস্কৃতির বস্তুভিত্তি খুঁজে ফিরতে ক্রমাগত তৎপর রেখেছে। নিজের একান্ত চর্চার বিষয় ধরে লিখলেন *The Use of the Cases in Vedic Pros*

(১৯২৯), একই আগ্রহে তৈরি হয় *Women's Dialect in Bengali* (১৯২৮) নিবন্ধ। ভাষাবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক তারাপোরেওয়ালা আবেস্তা এবং প্রাচীন পারসীকের একটি সংকলন পরিকল্পনা করেছিলেন। *Selections from Avesta* (১৯২২) সংকলনে কাজটির এক ভাগ তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তাঁর পথ ধরে সুকুমার সেন *The Old Persian Inscriptions of the Achaemenian Emperors* (১৯৪১) সংকলনে প্রকল্পটির অপরার্ধ সম্পূর্ণ করলেন। বেহিস্তুন পাহাড়ের গায়ে খোদাই ইখামনীষীয় (Achaemenian) সম্রাটদের এই লেখমালা খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ-তৃতীয় শতকের প্রাচীন পারসীক ভাষার নমুনা। বেদের ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য মিল থাকায় এই প্রাচীন পারসীক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনের অনন্য বস্তুভিত্তি। এ বস্তু সুকুমার সেন গবেষকদের হাতে যুগিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রচনা করেছেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৬) যা আজও এ বিষয়ে অদ্বিতীয় পাঠ্য বই।

বিংশ শতকের দুইয়ের তিনের দশকে সচেতন ভারতীয়দের সামনে জীবনের বড়ো কাজ সম্পর্কে স্থির কিছু কিছু লক্ষ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ঔপনিবেশিক শাসনের আঁটো হতে থাকা মুঠি, দেশময় বৈষয়িক দুঃস্থতা এসব চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশাভিমানী মনস্বীরা বিশ্বের সামনে জাতীয় আত্মপরিচয় উজ্জ্বল করে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের সৃজনে, মানববিদ্যার বিজ্ঞানবিদ্যার গবেষণায় এসময়ে প্রচুর কাজ হয়েছে দেশে। কোনো সংঘ বা সংগঠনে যাঁরা যাননি তাঁরাও আত্মমনস্ক অধ্যবসায়ে যে নিজেদের সংকল্প রূপ দেবার একাগ্রতা অটুট রাখতে পেরেছেন — তার কারণ দেশের হাওয়াটাই ছিল প্রেরণাময়। একথা সুকুমার সেনের মতো একলা সাধকের প্রসঙ্গে বিশেষ করেই মনে আসবে।

কী তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি — এ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, মতান্তরও সম্ভব। তবুও একটা দিক থেকে মনে করা যায় চারখণ্ডে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড ১৯৪০) এবং এরই আনুষঙ্গিক 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪), 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (১৯৫১) — মিলিয়ে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নির্মাণ তাঁর মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সুকুমার সেনের হাতে এ কাজ সম্পূর্ণ না হলে বাঙালির আত্মপরিচয় খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। ভিত পাকা হতে পারত না।

এ কাজের সূত্রপাত অবশ্য অনেক আগেই হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে দীনেশচন্দ্র সেন অবধি সাহিত্যের ইতিহাস গড়ারও একটা ইতিহাস আছে। সুকুমার সেন কে কোথায় কী করেছেন সেসবের খতিয়ান তৈরি করতে যাননি। একবার নিজেই বলেছিলেন, "একাজ করার আগে আমি কোনো হিস্ট্রি অব লিটারেচার পড়িনি। এমন কী দীনেশবাবুর বইও খুব ভাসা ভাসা ভাবে দেখেছি।"

(৮০ বছরের জন্মদিনে সংবর্ধনার উত্তর, শিশিরমঞ্চ)। এত বড়ো প্রকল্পে এগোতে হলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে অন্যদের কাজের সঙ্গে তুলনা করলে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকল্পের পদ্ধতি এবং সে পদ্ধতির যুক্তিযুক্ততা বোঝা যায়। সুকুমার সেন সাহিত্যের বিকাশ ইতিহাসের বিবর্তনের ভিতের উপরে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে তাই ভাগগুলি সরাসরি শতাব্দী ধরে। প্রত্যেক শতাব্দীর বিবরণ শুরু করার সূচনায় রেখেছেন শতাব্দীটির রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক-একটি অসামান্য সমীক্ষা। রাজনৈতিক শক্তির ওঠাপড়া, সমাজ-বিন্যাসের ভাঙাগড়া, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন উপাদানের আবির্ভাব নিয়ে অনুপুঙ্খ এই আলোচনাগুলিতে যে তীক্ষ্ম ইতিহাস বোধ, সমাজবিদ্যার বোধ ফলিত হয়ে আছে তেমনি সমগ্রদৃষ্টির পরিচয় আর কোথাও পাইনা। বাংলার ইতিহাসে অনেক ফাঁক, বাংলার সমাজ বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস ফুটিয়ে তোলার মতো নিশ্চিত উপাদান খুব বেশি নেই। ফাঁক ভরাবার জন্য কিছু কিছু অনুমানের উপরে ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। সুকুমার সেনের এই লেখাগুলিতেও তেমন অনুমান নির্ভরতা আছে অনেক জায়গায়। কিন্তু দেখবার বিষয়, পুঁথিপত্র থেকে, অলিখিত লৌকিক সাহিত্য থেকে কত খুঁটিনাটি উপাদানে তিনি অনুমান-গুলি কেমন নিপুণভাবে যুক্তিযুক্ত করে তুলেছেন। এই-যে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাস-কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, তার মধ্যে রাখেন বাঙালির ধারাবাহিক সাহিত্য কীর্তির অনুপুঙ্খ বিবরণ। এ বিবরণের উপাদান সংগ্রহ করেন সরাসরি পুঁথির উৎস থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভিন্ন সুকুমার সেনের আগে বা পরে আর-কারও পুঁথি-নিবন্ধ তথ্যাভিত্তির উপরে এত ব্যাপক দখল নেই। তাই অনেক ধাঁচের সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হলেও শেষ ভরসা রয়ে যান সুকুমার সেন। তাঁর কাজ চিরায়ত আকর-গ্রন্থ।

কী মনোভাব এবং চিন্তাধারার বশে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিবিষ্ট হয়েছিলেন, "সাহিত্য ইতিহাসের দাঁড়া" নামে একটি ছোটো লেখায় (*Jadavpur Journal of Comparative Literature*, Vol. 14-15, ১৯৭৬-৭৭) সে কথা নিজেই অনেকটা বলে গেছেন। পদ্ধতির প্রশ্নে এই লেখাটির কিছু অংশ এখানে তুলব :

"বস্তু ও বিষয় সাহিত্য হলেও তার অবগতি ইতিহাস-দৃষ্টিতে। তাই সাহিত্য-ইতিহাসের ব্যাপারে ইতিহাসের প্রয়োজন ভুললে চলবে না। বিষয় স্থান এবং কাল এই তিন আয়ামের [আয়াসের ?] মধ্যে দিয়ে দেখতে এবং দেখাতে হবে। এই-ই হলো সাহিত্য-ইতিহাস লেখকের প্রণিধান। আমার দৃষ্টিও তাই পুরোপুরি ইতিহাসের। নিজেকে নিরপেক্ষ রাখতে প্রযত্ন করেছি, কিন্তু কোনো অঞ্চল বা গোষ্ঠীবিশেষের সম্ভাবিত অপ্রিয়ভাজনতা পরিহার করবার জন্য ইতিহাসকে

প্রত্যাখ্যান করিনি অথবা চেপে যাইনি। আমি ভেবেছি এবং ভাবি যে আমি পরিপূর্ণ বাঙালী; কোনো নদীনালা প্রান্তর জঙ্গল দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে আমার ইতিহাসের বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন নয়। এককথায় আমি লোকাল পেট্রি-অটিজমের কোনো প্রশ্রয় দিইনি।

"ইতিহাস দুটো স্তরের উপর গড়া। এক কালক্রমে (chronology), দুই বর্ণনা (narration, story)। জীবদেহ গঠনে মেরুদণ্ডের মতো ইতিহাস-গঠনে কালক্রম তার দেহভিত্তি, আর অস্থি মাংস রক্ত চর্মের মতো বর্ণনা। সুতরাং কালক্রম ভাবনা অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা করা যায়না, তবে উপাদেয় আখ্যান রচনা করা যায়। ... আমি কালক্রমকে খুঁটিয়ে অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি। যেখানে পারিনি সেখানে বুঝতে হবে উপাদানের অভাব আছে। এই কারণে আমার লেখা ইতিহাসের কথায় মাঝে-মাঝে ফাঁক আছে। ইতিহাসের খাতিরেই আমি সে ফাঁক কল্পনা অথবা অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে বুজোতে চাইনি।

"যে কালের রচনা সে-কালের মানুষের রুচি কেমন ছিলো তা ধরতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু এ-বিষয়ে উপাদান প্রায় নেই বললেই হয়। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এদিক ওদিক থেকে খুঁটিনাটি কুড়িয়ে নিয়ে একটু আধটু আভাস দিতে। যাদের জন্যে সাহিত্য প্রসূত হয়েছিলো তাদের দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্যকে দেখাই সাহিত্যের ইতিহাস সৃষ্টি। তবে ইতিহাস যে খণ্ড কালের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়না, তা শেকলের মতো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের সঙ্গে জড়াজড়ি করে এগিয়ে চলে, এ সত্যও সাহিত্য-ইতিহাসের লেখকের সামনে সর্বদা উন্মুক্ত থাকা চাই। সেদিকে আমি সর্বদা অবধান রেখে চলেছি।

"তবে মানুষের কাজ মাত্রেই ভ্রম ও প্রমাদ কিছু-না-কিছু থাকবেই। আমার কাজেও আছে। কিন্তু সে-বিষয়ে আমি সর্বদা সতর্ক থেকেছি। নিজের ভুলকে আমি অপরের ভুলের চেয়েও নির্মমভাবে লিখেছি। ... যা সত্য বলে বিবেচনা করবো, তা বলবো। বলা বাহুল্য এখানে সত্য বলতে absolute truth নয় (-- তা কেউই জানে না), তথ্য ও যুক্তি সহযোগে আপন্ন সত্য। এমন সত্যনিষ্ঠার জন্যেই কোনো কোনো পাঠক আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বীতস্পৃহ এবং আমার বই সম্বন্ধে নিস্পৃহ। বুঝি যে এঁরা চান ইউক্লিডের জ্যামিতির মতো অনড় পাঠ্যপুস্তক। আমি তা দেবো কোথা থেকে ?"

(নিবন্ধটির শেষে একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই মার্কসবাদী বামপন্থী সাহিত্য-পথিকদের সম্পর্কে কটাক্ষ আছে,

"... এঁদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুধু এই যে অতীতকালের ইতিহাস আলোচনায় মার্কসবাদ বা কমিউনিস্ট প্রেরণা স্বীকার করা ভবিষ্যতের ঠিকুজিতে অতীতের কুলজী পড়ার মতোই নিরর্থ।"

মন্তব্যটিতে মার্কসবাদী ইতিহাস-দৃষ্টি সম্পর্কে সুবিচার প্রকাশ পায়নি।

মানুষের ইতিহাসে এক-একটি পর্বের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের চাপ কীভাবে গোটা সমাজকে পর্বান্তরে উত্তীর্ণ করে দেয় — মার্কসবাদ সেই বাস্তবকে বুঝতে সাহায্য করে। মার্কসবাদী অতীতের কুলজী বিশ্লেষণ করেন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঠিকুজি বুঝবার এবং ভবিষ্যৎকে নির্মাণের গরজে।)

শেষ কথা বলে দেবার দাবি কোনো সুস্থবুদ্ধি ঐতিহাসিকই করেন না। আমাদের ইতিহাসতত্ত্বের ধ্যান কী হবে — এ প্রশ্নে বিচার বিতর্কের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রাজেন্দ্রলাল মিত্র-রমেশচন্দ্র দত্ত-অক্ষয়কুমার দত্ত-রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে রবীন্দ্রনাথ-অতুলচন্দ্র গুপ্ত-নীহাররঞ্জন রায় অবধি বিলেতের আমদানি "বৈজ্ঞানিক ইতিহাস"-এর বিকল্প তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবৃত্তের বদলে জনবৃত্তের জীবন প্রবাহের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশকাল নিরপেক্ষ "বৈজ্ঞানিক ইতিহাস"-এর তত্ত্ব খণ্ডন করেন। এই চিন্তাসূত্রের উত্তরাধিকার পাই অতুলচন্দ্র গুপ্তর উক্তিতে,

"বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃ-পুনঃ শুনিয়া মনে হয়, বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পেঁছিনো যায়। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পেঁছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই, তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের এক দর হইত।" ('ইতিহাসের মুক্তি', ১৯৫৭, পৃ. ৮২)।

কোনো ইতিহাসেই তাই "ইউক্লিডের জ্যামিতির মতো অনড় পাঠ্যপুস্তক" লেখা যায়না। সুকুমার সেন ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের লেজুড় বিদেশি ও দেশি ঐতিহাসিকদের ইতিহাসতত্ত্বের বিকল্প তত্ত্বভাবনা থেকেই আলো পেয়েছেন। সে আলোকেই তিনি সাহিত্যের ইতিহাস লেখার বস্তুভিত্তির খোঁজে বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপগুলি জেগে উঠেছিল যে মানব-পরিবেশে, সেই পরিবেশটির মধ্যে যেতে চান। সে পরিবেশ সজীব করে তুলতে "এদিক ওদিক থেকে খুটিনাটি কুড়িয়ে আনতে" হয়। নির্দিষ্ট কালের মানুষের রুচি-প্রকৃতি অনেক আয়াসে ফুটিয়ে তুলতে হয়। পাকা মাথা ঐতিহাসিকের অগ্রাহ্য শতবিধ তুচ্ছ তথ্য এই লোকজীবন-অভিমুখি ইতিহাস-দৃষ্টিতে মহার্ঘ হয়ে ওঠে। সুকুমার সেনকে কেউ বলতে পারতেন, তাঁর জীবনকালে এদেশের ইতিহাসচর্চায় এই লোকজীবন-মুখি দৃষ্টিরই প্রতিপত্তি ক্রমে অবাধ হয়েছে এবং এ নতুন প্রজন্মের ঐতিহাসিকেরা তত্ত্বগত অবস্থানে অনেকেই মার্কসবাদী। সুকুমার সেন মশায়ের প্রখর বাস্তবতাবোধ তাঁর গবেষণাকে যে পথে চালিয়েছে সে পথে মার্কসবাদীদের তাঁর সহযাত্রী হতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়।

৩

এই লোকজীবনমুখি ইতিহাসতত্ত্বের প্রসঙ্গেই সুকুমার সেনের সারাজীবনের কাজে আর একটি গুরুত্বময় প্রবণতার কথা ওঠে। লোকজীবনের আনাচ-কানাচ থেকে ইতিহাসের উপাদান তুলে আনার ঝোঁকেই তাঁর মনের প্রগাঢ় টান ছিল ফোকলোরের দিকে। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের খণ্ডগুলির ঘনিষ্ঠ পাঠক লক্ষ করবেন, গুরু সাহিত্যের পরিমণ্ডল ফুটিয়ে তোলায় কতভাবে তিনি লোক-কথা, প্রবাদ-প্রবচনের উপাদান কাজে লাগিয়েছেন। অনেক পরে, সুনীতি-কুমারেরই অনুজ্ঞায় লেখেন 'রামকথার প্রাক-ইতিহাস' (১৯৫৪)। তুমুল বিতর্ক জাগানো কিছু প্রসঙ্গ এই পুস্তিকায় যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যয়গত করে তুলতে ঠিক একই ভাবে নানা উৎস থেকে লোক প্রচলিত কথা-বস্তু জড়ো করেছিলেন। ফোকলোরে তাঁর প্রাণের এই টান এক আশ্চর্য ফসল ফলায় 'রামকথার তন্ত্র' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৬-৫৮ বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা) প্রবন্ধটিতে। এ রচনায় নিবিষ্ট হয়ে আর একবার মনে হয় মননজীবী মনস্বীর মধ্যেও সৃজন-বৃত্তি এবং লেখাকে স্বাদু করে তোলার ক্ষমতা কাজ করে। না হলে এমন রচনা কী করে তৈরি হয়।

পরিতাপেরই কথা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লোক-সংস্কৃতি চর্চায় বরাবর সুকুমার সেনকে পাশ কাটিয়ে আসা হয়েছে। লোকজীবন অভিমুখ ইতিহাসদৃষ্টির সঙ্গে অধীত ও শ্রুত বিদ্যায় ব্যাপক অধিকার এবং রসজ্ঞতা মিললে লোকসংস্কৃতি চর্চা কোন স্তরে উঠে যায়, তেমন কাণ্ডজ্ঞান লোকসংস্কৃতি চর্চায় কীভাবে বহুমুখ তাৎপর্য আনতে পারে — সুকুমার সেনের কাছে আমাদের সে শিক্ষা নেবার ছিল। সে শিক্ষায় অ্যাকাডেমিক লোকসংস্কৃতিবিদদের পঙ্গুতা খানিকটা ঘুচত বোধ হয়। শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ফোকলোরের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা মিলিয়ে কোনো দেশীয় ঐতিহ্যের মর্ম বোঝার একটি মডেল রয়েছে তাঁর বিজ্ঞান খুব যে কেউ কাজে লাগিয়েছেন — চোখে পড়েনা।

কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণের উজ্জ্বল সব ফসল ফলেছিল সাহিত্যের উপর তলায়। প্রেসের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় বহু প্রেস বসল। ছেপে প্রকাশ করার সুযোগে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাচীন ধারা সুকুমারবাবুর ভাষায়, "যা একদা ভূতলবাহী হয়ে গিয়েছিল তা এখন নূতন অবস্থায় ধীরে ধীরে বাইরে ক্ষীণ ধারায় বেরিয়ে এল।" এই নিয়ে বটতলার বইয়ের বাজার, যেসব বই ক্রমে মেয়েদের সাজগোজের জিনিশের সঙ্গে ফিরিওয়ালাদের ঝাঁকায় চেপে গ্রামগ্রামান্তরে ছড়িয়ে গেছে। নাগরিক সাহিত্যের এই নিচুতলার খবর সুকুমারবাবুর চেয়ে কেউ বেশি জানতেন না। তাঁর বর্ধমানের বাড়িতে বটতলার বইয়ের বিশাল সংগ্রহ দেখা

একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাঁর নিজের দেওয়া বিবরণ রয়েছে 'বটতলার ছাপা ও ছবি' (১৯৫৪) বইয়ে।

বাঙালির মনের গোটা এলাকা জরিপ করার জন্যেই যে নিজেকে পরিপূর্ণ প্রস্তুত করেছিলেন — এসব দৃষ্টান্তে তা বোঝা যায়।

৪

গল্পরসে মশগুল মানুষ ছিলেন সুকুমার সেন। যে কোনো প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই গল্প-কথার ভিয়েন আপনি এসে যেত। ফলে তাঁর মেজাজ ভালো থাকলে আলাপচারিতে মজিয়ে দিতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহের জন্য টীকা তৈরির পরামর্শ দিচ্ছেন এমন সময়ে এক ঝাঁক অধ্যাপক এলেন। তাঁদের এক সংকলন-প্রকল্পের ভূমিকা লিখে দেবার কথা। ভূমিকাটির জন্য তাড়া দিতে এসেছেন। চুপচাপ শুনলেন তাঁদের বক্তব্য। জিজ্ঞাসা করলেন, তা আপনাদের ছাপা কেমন এগোলো। বই বেরোচ্ছে কবে? সে কথার কোনো নির্দিষ্ট উত্তর এলনা। চেয়ারে একটু দোল খেতে খেতে বললেন ওঁদের, জানেন তো আমাদের গাঁয়ে ছিল এক স্বর্ণকার। এক বড়ো মানুষের শখ গেছে খড়্গে সোনার বোল লাগাবেন। স্বর্ণকারকে ফরমাশ করা হল। তারপর কেবলই এসে তাড়া দেন, সোনার বোল হল? বিরক্ত স্বর্ণকার শেষটায় বলে — আরে মশাই আপনার খড়্গ কই? আগে খড়্গ তো হোক, তার পর সোনার বোল লাগাবেন। গল্পটি শেষ করে আগত অধ্যাপকদের দিকে কৌতুক ভরা মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লেন।

কখনও বা জমিয়ে তুলতেন ভূতের গল্প। একেবারেই সত্যি ভূতের গল্প সব। কিন্তু তারও মধ্যে যুক্তি মেলানোর মতো একটা ফাঁক রেখে দিতেন বেশ কৌশলে। একবার আক্ষেপ করে বললেন, প্রমথ বিশী আমার একটা চমৎকার গল্প একেবারে মাটি করেছে। কেন যে বলতে গেলুম! সেটা হল বর্ধমান-হাওড়া লোকাল ট্রেনের এক ভুতুড়ে ইঞ্জিনের গল্প। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সে ইঞ্জিন মারাত্মক ভাবে লাফিয়ে উঠবেই উঠবে। এমন যে, অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, অথচ লাফানোর কোনো যন্ত্রঘটিত কারণ ছিলনা। শেষে বেরোয়, ঠিক ওইখানটায় এই ইঞ্জিনের ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান এক ব্যক্তিকে খুন করে আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে উতপাতের শুরু। ও'র মুখে শুনে প্রমথনাথ বিশী গল্পটি আনন্দবাজারে লেখেন। মনে পড়ে, বিশ্বভারতী পত্রিকায় (শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা ১৩৫৩) কত দিন আগে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, "আমাদের সাহিত্যে ভূতের গল্প"। অনেক বার বলতে শুনেছি, একজন ছাত্র পেলে এ বিষয়ে গবেষণা করানো যেত। জানিনা তেমন ভূত-ভাবুক কোনো ছাত্র পেয়েছিলেন কিনা।

অন্য দিকে আকৈশোর তিনি ছিলেন ডিটেক্‌টিভ গল্প-খোর। এ নেশার সঙ্গী হয়েছিলেন একসময়ে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। উপভোগ থেকে শেষটায় সৃষ্টিতে গেলেন, ৭০ বছর পেরিয়ে নিজেই ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্পমালার ডিটেক্‌টিভের নাম মহাকবি কালিদাস। গল্পগুলির পরিমন্ডলে কালিদাসের কাল সজীব হয়ে উঠেছে। এই সৃজনকর্ম সম্পর্কে বেশ একটু দুর্বলতাই ছিল বলা যায়। একদিন বেশ লজ্জা লজ্জা করে বললেন, জানো তো তোমাদের সমরেশ বসু এসেছিলেন ও'র মহানগর পত্রিকার জন্য আমার একটা গল্প চাইতে। অত বড়ো লেখক — কেমন বিনয় করে আমায় লেখা দিতে অনুরোধ করলেন! চুপচাপ শুনে যেতে হয়। কারণ, কথাটা বলছেন স্বয়ং সুকুমার সেন। সমরেশ বসু নিশ্চয়ই খুব বড়ো মাপের লেখক, কিন্তু সুকুমার সেন যেন কিছুই নন! ও'র এমন লজ্জা-বিনম্র ভঙ্গি দেখা — এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

৫

ঠাঁই নাড়ায় ঘোর আপত্তি। নিতান্ত প্রাণের গরজ না হলে কোথাও যেতে চাইতেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান নৈহাটিতে। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার আসবার কথা পাড়তে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আমার খুবই যাওয়া উচিত। সুনীতিবাবু একবার গেছেন আমারও যাওয়া কর্তব্য। জানো তো ও-ডি-বি-এল প্রকাশের পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজের পটলডাঙার বাড়িতে সুনীতিবাবুকে একটা ঘরোয়া সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছিলেন। তখনকার বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ওই বয়সে আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। সে চিঠিটি এখনও আমার কাছে আছে। [illegible]র ৯ ডিসেম্বর নৈহাটির শাস্ত্রীবাড়ির আঙিনায় অনুষ্ঠান হল। অন্নদাশঙ্কর রায় এবং সুকুমার সেন বৈঠকি মেজাজে শাস্ত্রী মশায়ের কর্ম ও কীর্তি নিয়ে আলোচনা করলেন। আসা যাওয়ায় খুবই কষ্ট হল। কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলেন এসে। যেন একটা পবিত্র কর্তব্য সমাপন করলেন।

এই সময়ে থেকেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ সম্পাদনায় তিনি উপদেষ্টা হিশাবে জড়িয়ে যান। রচনা-সংগ্রহ ছাপা হবে রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে। নৈহাটির হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রে সকলেরই উদ্বেগ, শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রকল্পের সঙ্গে থাকবেন তো। কারণ, এ সময়টাতে ক্রমেই বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি ভাষানীতি সম্পর্কে তিনি বিরূপ হয়ে উঠছিলেন। বামফ্রন্ট বিরোধী রাজনীতির লোকেরা তাঁকে সভাসমিতিতে টানতে শুরু করল। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই সরকার বিরোধী বিবৃতি দিচ্ছেন এবং দেখা হলেই বেশ কঠোর ভাষায় সরকারের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ

করছেন। ইতিমধ্যে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ' প্রথম খণ্ড ছাপা শেষ হল। সকলেরই ইচ্ছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি অনুষ্ঠানে বই প্রকাশ করা হোক। সেখানে অবশ্যই সুকুমার সেনকে আনতে হবে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষও তো থাকবেন। এটা মেনে নেবেন কিনা — সেও এক অনিশ্চয়তা। মেনে অবশ্য নিলেন খুবই প্রসন্ন ভাবে। পরিষদে এলেন এবং যা কখনও করেন না, কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেই দোতলায় রমেশ ভবনে উঠে গেলেন। ১৯৮০-র ১৭ জানুয়ারি তারিখের সে অনুষ্ঠানে শম্ভু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে শম্ভুবাবুর হাত হাতে নিয়ে বললেন, আপনাদের সঙ্গে আমার নানান বিষয়ে মতের অমিল। তবুও দেখুন এ অনুষ্ঠানে এসেছি। এ রকম ভালো কাজ করলে আমাকে সর্বদা পাবেন।— খুবই জমাট সভা হল। সারাক্ষণ বসে উপভোগ করলেন। বই দেখে খুব আনন্দ। বারবারই বলেন, এ একটা কাজের কাজ হচ্ছে।

ভাষানীতি শিক্ষানীতি নিয়ে যা বলতেন তখন, সে মত সমর্থন করা সম্ভব হতনা। কুণ্ঠিতভাবে একটু আধটু তর্ক করতেও হত। বলতে হত, এভাবে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যাওয়াটা আপনার পক্ষে ভালো হচ্ছেনা। কখনও তো রাজনীতি করেন নি। এর একটা এমন স্রোতের টান — যে না জেনেই অনেকটা চলে যাবেন, কিন্তু মানিয়ে নিতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত দেখলাম খবরের কাগজে ঘোষণা করা হলেও রাস্তায় আইন অমান্যের হুজুকে যাননি। এসব সত্ত্বেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ সম্পাদনার কাজে কখনও কিছু মাত্র অসুবিধা হয়নি। এমন অনেক প্রশ্ন উঠেছে যা সমাধান করে দিতে চোখের অসুবিধে উপেক্ষা করে প্রায়ই ওঁকে নানা বই ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে। তাতে কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি। যে সব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন সময়ে এই প্রকল্পে কাজ করেছে তাদের একেবারেই কাছে টেনে নিয়ে তৈরি করে তুলতে যত্ন নিয়েছেন, অনেক সময় দিয়েছেন। সেই ধৈর্য, সেই আদর তারা চিরদিন স্মরণ করবে। প্রথম দিকে কাজের অনেকটা দায়িত্ব বহন করতে হত দেবপ্রসাদকে (ভট্টাচার্য)। মনে আছে, সে একদিন অনেক রাতে হাজির। কী হল জানতে চাওয়ায় বলল, একটা ব্যাপার না বলে বাড়ি যেতে পারলাম না। সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে কাজ সেরে উঠতে রাত নটা পেরিয়ে গেল। উঠছি এমন সময়ে উনি কাছে ডেকে জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বললেন, এ কী তোমার যে গায়ে কোনো গরম জামা নেই। এই শীতে যাবে কী করে! — বুঝলাম, এতটা পথ পেরিয়ে এসেও শ্রীমানের রোমাঞ্চ যায়নি, অভিভূত দশা কাটেনি।

ভয়ই পেত সকলে। কাছে যেতে সব বয়সের মানুষই সসংকোচে যেত। কিন্তু কেউ কাজ করছে বুঝতে পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ব্যবধান রাখতেন না। শুধু পরামর্শ দেওয়া নয়, নিজের সংগ্রহ থেকে দুর্লভ বইপত্র

দিয়েও সাহায্য করতেন। তখন প্রকাশ পেত ভিতরের এক অন্য মানুষ। স্নেহে, মমতায় দ্রব সেই সুকুমার সেনকে কী করে ভোলা যায়!

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সম্পর্কে তাঁর মন বিরূপ ছিল — সবাই জানেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের ধারা, সজনীকান্ত দাসদের কর্তৃত্বের চেহারা — এসব নিয়ে কঠোর মন্তব্য কে না শুনেছেন। কিন্তু ষাটের দশকে পরিষদে 'ভারতকোষ' সংকলনের উদ্যোগে যখন সত্যি সত্যি একটা বড়ো কাজের হাওয়া তৈরি হল, প্রবীণ এবং তরুণ পণ্ডিত গবেষণা-কর্মীরা জোট বাঁধলেন, তখন পরিষৎ সম্পর্কে তাঁর অত ক্ষোভ যেন মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। প্রায় প্রত্যহ দুপুর তিনটে থেকে দু-তিন ঘণ্টা সময় দিতেন ভারতকোষ-এর কাজে। কোষগ্রন্থের রচনা বর্ণানুক্রমে সাজতে হয়। মাঝখানে কোনো একটা ছোটো লেখাও তৈরি যদি না হয়ে ওঠে তো ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সুকুমার সেনের কাছে কোনো ফাইল কখনওই আটকে থাকেনি। বরং নির্দিষ্ট কোনো কেনো লেখা যথাসময়ে পাওয়া যায়নি জেনে নিজেই লিখে দিয়েছেন। মাপা আয়তনের মধ্যে সেসব রচনা চিন্তার মৌলিকতায় এবং প্রকাশের নিপুণতায় যে কেমন অনবদ্য হয়ে উঠত 'ভারতকোষ'-এ 'কলকাতা', 'কথা' এ রকম প্রসঙ্গগুলি একবার পড়লে উপলব্ধি হবে। প্রায় কালি না শুকোনো তৈরিলেখা পড়তে দিয়ে চেয়ারে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছেন। পড়া শেষ করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইতেই খুব হেসে বলে উঠলেন, কী! পাবে কোথাও এরকম লেখা। সে মুহূর্তে মনে হত — এ অহংকার কী মনোহর!

'ভারতকোষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত সবাই এক সভায় বসেছেন সাহিত্য পরিষদে। রিভিউ হবে। সুকুমার সেন এলেন ওঁর পাওয়া খণ্ডটি হাতে নিয়ে। সুনীতিবাবু সভাপতি। সভা শুরু হতেই বইখানা খুলে পাতার পর পাতা উলটে ভুলভ্রান্তির নজিরগুলো দেখাতে লাগলেন। সভা তটস্থ। বোঝা গেল, আগাগোড়া সমস্ত প্রসঙ্গ খুঁটিয়ে পড়ে এসেছেন। সুনীতিবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, এ রকম কাজে ভুলভ্রান্তি একটু হয়ই। হিন্দি কোষগ্রন্থেও দেখেছি প্রচুর ভুল আছে। তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওধার থেকে সুকুমারবাবুর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, হিন্দি কোষগ্রন্থ! সেখানে কি কোনো সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আছেন? সুনীতিবাবুর যেন মাথাটা চওড়া কাঁধের মধ্যে বেশ দেবে গেল।

অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল সুনীতিবাবুর সঙ্গে। সুনীতিবাবু আছেন, তাহলে কাজে কোনো রকম ত্রুটি থাকবে কেন! প্রত্যাশা কত বড়ো মাপের! আজ তো প্রায় অবিশ্বাস্যই লাগবে, সুনীতিবাবুর ও-ডি-বি-এল ছাপা হচ্ছে, তার ইনডেক্স করছেন সুকুমার সেন। এই কাজটি করতে করতে অনেক নতুন নতুন দৃষ্টান্ত যোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। সুনীতিবাবু মেনে নিয়ে সংযোজন করে দিচ্ছেন।

এ নিয়ে খুব গর্ব করতেন সুকুমার সেন। আবার অধ্যাপনা ছেড়ে সুনীতিবাবু মন্ত্রী হতে চলেছেন শুনে সকালবেলা উঠে তাঁর বাড়িতে প্রবল বকাবকি করে এসেছেন।

সুনীতিবাবু মারা গেলেন। মনে হল সুকুমারবাবুর কাছে একবার যাওয়া উচিত। কেমনভাবে নিলেন এ বিচ্ছেদ! গিয়ে দেখি চুপচাপ বসে আছেন। একথা সেকথার পরে বললেন, ভাবছি কলকাতা ছেড়ে এবার বর্ধমানে চলে যাব। উচ্চারণে, স্বরে, মুখের ভাঙাচোরা রেখায় অপার ব্যথিত একটি মানুষ। কেন যাবেন স্যার — জিজ্ঞাসা করতে সেই স্বরেই বললেন, রিটায়ার করার পর এই ছোটো বাসায় খুব কষ্ট করেও থেকেছি একটিই কথা ভেবে। কলকাতায় থাকলে ঠেকে গেলে সুনীতিবাবুর সাহায্যটা সহজে পাবো। সেইজন্য বর্ধমানে ফিরে যাইনি। আর কেন কলকাতায় থাকব? — এমন ব্যথিত মানুষকে তো কিছু বলা যায়না। করুণার্দ্র হয়ে, নত হয়ে, নীরব থাকতে হয়।

৬

আকাশ বাণীর তরফে কয়েকজন জিজ্ঞাসু এসেছেন। প্রশ্ন করছেন এবং সুকুমার সেনের দেওয়া উত্তরগুলি রেকর্ড করছেন। সব প্রশ্নই তাঁর লেখাপড়া চিন্তাভাবনা নিয়ে। উত্তরে বলছেন, আমি নিজের পথে চলেছি। কেউ তো আমাকে বলে দেয়নি — এ কাজ করো কি এটা কোরোনা। নিয়তই দেখছি পড়ছি জানছি। তার সবটাই লিখে যেতে চেষ্টা করছি। ভুল বুঝতে পারলে শুধরে নিচ্ছি। এছাড়া আমার আর কী কাজ। একটি প্রশ্নে নীরব শ্রোতাদের উৎকর্ণ হতে হল। আপনার কি কোনো ক্ষোভ আছে? কোনো অপূর্ণতা? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন, না না আমার কোনোই ক্ষোভ নেই। আমি তো কারও কাছে কিছু চাইনি, কোনো প্রত্যাশা নিয়েও কোনো কাজ করিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলাম সেখানেই একটানা পড়িয়েছি। রিটায়ার করে আর ওমুখো হইনি। এমনকী ফেয়ারওয়েল নিতেও যাইনি। শুধু একটা কথা মনে ওঠে কখনও কখনও। বিশ্ববিদ্যালয় তো কখনও আমায় এমারিটাস প্রফেসার করার কথা ভাবেনি। এই মর্যাদা তো অনেককেই দেওয়া হয়েছে, আমার কথা মনে পড়েনি সে নিয়ে অবশ্য আমি কোথাও কিছু বলতেও যাইনি কখনও। কথাটা মনে উঠেছে এই মাত্র।

ভাবলে অবাকই লাগে। মানববিদ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, যাঁর সাহায্য ভিন্ন এই বিদ্যার অগ্রগতি অসম্ভব ছিল — তাঁর কথা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও স্মরণ করেনি। সুকুমার সেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেবার পরে কতবার কর্তৃত্ব বদল হয়েছে। এ মানুষটি বোধহয় কোনো পক্ষেরই মন জুগিয়ে চলতে পারেন নি। দূরে থেকে সাম্মান জানালেও কেউই তাঁকে তাই আনুষ্ঠানিক মাননা জানায় নি।

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পাকা চাকরিও সহজে হয়নি। সে গল্পটা একটা সভায় নিজেই বলেছিলেন। টেপ থেকে এখানে তুলে দিই :

"এবার আমি একটু দুঃখের কথা বলি। সুনীতিবাবু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে গেলেন, আমায় তাঁর সাবস্টিটিউট দিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে একটি লেকচারারের পদ তৈরি হল। আমি আবেদন করলুম। আমার চাকরি হল, কিন্তু ছমাসের জন্য। এমনি করে ছমাস ছমাস করে দুবছর চলতে লাগল। তখন সুনীতিবাবু পারসোনা ননগ্রাটা টু দি অথরিটি। আমি তাঁর চেলা। তাই তাঁরা আমাকেও পছন্দ করতেন না। এখন একটা কথা বলে রাখি। সে হচ্ছে ইতিহাস। যতই রূঢ় হোক সে ইতিহাস। এ বিরুদ্ধতা কাটানো দেওয়ার একটা উপায় হল খোশামোদ। আমার এক দোষ আমি কারও কাছে যাইনা, কাউকে খোশামোদ করিনা। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে করেছি। সজনীবাবুর যে মাসিক পত্র বঙ্গশ্রী তাতে আমি বাংলা গদ্যের ইতিহাস ধারাবাহিক লিখতে লাগলুম। সে লেখাটি যখন সম্পূর্ণ হল, সজনীবাবু বললেন, আমি [বই করে] ছাপবো, আপনি রাজি আছেন ? সে বইটি ['বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', ১৩৪১] যখন ছাপা হল আমি তখন ওই বইটি ডেডিকেট করলুম শ্যামাপ্রসাদকে [তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলার]। আমার ডেডিকেশনের টার্মটিও খুব ভালো ছিল — কালিদাসের একটি শ্লোক * তাতে আমার চাকরি পাকা হয়ে গেল।

এই সঙ্গে এও স্বীকার করি, দ্বিতীয় সংস্করণে ও ডেডিকেশনটা আমি তুলে দিয়েছিলাম।" (৮০ বছরের জন্মদিনে সংবর্ধনার উত্তর, শিশিরমঞ্চ)।

৭

আমি তো কখনও থেমে থাকিনি। নিজের মনে কাজ করে চলেছি। — কথাটায় প্রকাশ পেত তাঁর দায়িত্ব-চেতনা। দায়িত্ব নিজের প্রতি এবং বিদ্যা-জগতের প্রতি। কোন্ তরুণ বয়সে নিজের মধ্যে মনীষিতার স্বাদ পেয়েছিলেন। একটি প্রত্যয় জেগে উঠেছিল নিজের মধ্যে। এই প্রত্যয়কে ফলবান্ করে তুলবার নিষ্ঠায় এবং শ্রমে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। সে শৃঙ্খলা

---

* উৎসর্গ পত্রে ছিল,

প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েষু

কালিদাসের রঘুবংশ থেকে (পঞ্চম সর্গ, ৩৭ শ্লোক) তোলা। রঘু এবং তার ছেলে অজ সম্পর্কে এই শ্লোকে বলা হয়েছে, "প্রদীপ্ত প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হলে যেমন উভয়ে কোনো পার্থক্য থাকেনা, রঘু এবং ছেলে অজ-এর মধ্যেও তেমন কোনো প্রভেদ দেখা গেল না। সুকুমার সেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমান উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।

মৃত্যুর আগের দিন অবধি মেনে চলেছেন। সবাই জানেন, তাঁকে কাজ করতে হত একটি মাত্র চোখ নিয়ে। সে চোখেরও শক্তি তেমন জোরালো ছিলনা। পরে তো অন্ধই হয়ে গেলেন। এ অপটুতাকে যে গ্রাহ্যই করেন নি, জাগর অবস্থার প্রতিটি মুহূর্তেই যে কাজে লাগিয়েছেন — রচনার বৈচিত্র্যে এবং বিপুলতায় তার প্রমাণ রইল। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক মনন চর্চায়, উদ্ভাবনায় নিজের পথ তৈরি করে এগিয়েছেন। বিরুদ্ধ তত্ত্ব নজরে আসা সত্ত্বেও, বিপরীত যুক্তির অকাট্যতা বোঝা সত্ত্বেও নিজের মত আঁকড়ে থাকার প্রবণতায় প্রকট হয় মনের রক্ষণশীলতা। সে পাণ্ডিত্য কালে অগ্রাহ্য হয়েই যায়। সুকুমার সেনের মধ্যে এমন রক্ষণশীলতা দেখিনি। তাঁর বইগুলির বিভিন্ন সংস্করণ মেলালে দেখা যাবে নতুন বস্তু, নতুন যুক্তি ক্রমাগত আত্মস্থ করে নিচ্ছেন। খুব অখ্যাত লেখকের হয়তো কারোই চোখে না পড়া লেখারও সম্বন্ধ উল্লেখ তাঁর বইয়ে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মতামতের প্রশ্নে সহিষ্ণুতা কতদূরে যেতে পারে — সে আমরা বারবার দেখেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহের প্রাসঙ্গিক তথ্য তৈরি করতে গিয়ে। ওঁর কোনো মত অনেক তর্কেও যখন আমরা মানতে পারিনি তখন রফা হয়েছে — একই বিষয়ে দুটি টীকা থাকবে। একটি ওঁর স্বাক্ষরে অন্যটি সম্পাদকদের মত, অস্বাক্ষরিত। এমন অনেক টীকা রচনা-সংগ্রহে দেখা যাবে। দূরে থেকে যাঁরা তাঁর অহমিকা দেখেছেন কাছে গিয়ে কাজ করতে তার লেশ মাত্র আমরা দেখিনি। কত সময়ে প্রয়োজনীয় টীকার বয়ান নিজে হাতে তৈরি করে দিয়ে বলেছেন একবার জিনিশটা শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মশায়কে দেখিয়ে নিও। কিংবা বলেছেন, বৌদ্ধবিদ্যাটা আমার ভালো আয়ত্তে নেই — তোমরা মূল বইপত্র ভালো করে দেখ তো। এই প্রসঙ্গেই মনে আসে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তরুণ গবেষক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "কৃষ্ণমিশ্র কি বাঙালী ছিলেন" প্রবন্ধ লেখেন। (৮৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) এ প্রবন্ধে ভুরশুট-এর অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত সব মত তিনি খণ্ডন করেছিলেন। পরের সংখ্যায় শুরুতেই "রাঢ়াপুরী ও ভূরিশ্রেষ্ঠক" নামে সুকুমার সেনের একটি দেড় পাতার লেখা ছাপা হল। সুকুমারবাবু লিখছেন :

"কাল সন্ধ্যার পর ৮৬ তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা আমার হাতে এল। আজ সকালে তা পড়তে বসলুম। সূচিপত্র দেখে প্রথমেই খুললুম শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণমিশ্র কি বাঙালী ছিলেন' প্রবন্ধটি।

"তিন চার পাতা উল্টোতেই আমার চোখ পড়ল ভুরশুটের আলোচনায়। আমার মনে হল এব্যাপারে আমি প্রকাণ্ড ভুল করেছি। আর সকলের মতো রাঢ়াপুরীকে রাঢ়দেশের নামান্তর মনে করে এবং অহংকারের উক্ত 'ভুরিশ্রেষ্ঠক' শব্দটিকে শ্রীধরের উক্ত 'ভূরিসৃষ্টি' গ্রামের নামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ভুল করেছি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি তা নয়।"

যতদূর জানি, কেউ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যর প্রবন্ধ সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য জানতে চাননি। নিজে থেকেই লেখাটি সাহিত্য পরিষদে পাঠিয়েছিলেন। এমনভাবে নতুনদের কাজে সাড়া দেওয়ায় প্রগতিমুখী মনস্বীর গরিমাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চিন্তাভাবনায় যেমন, তেমনি লিখন-শৈলীতেও ক্রমেই যে নিজেকে অতিক্রম করে এগিয়েছেন, চক্রাকারে ঘোরেন নি সাহিত্যে রুচি আছে এমন পাঠক মাত্রেই সুকুমার সেনের লেখার সংস্পর্শে এটা অনুভব করবেন। কোনোদিনই "ধন্তেদন্ত্র মার্কা" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বুলি) ভাষায় লিখতেন না। সহজ সরল সাধু গদ্যে লেখা শুরু করেছিলেন। আবারও সুনীতিবাবুর কথা এসে পড়ে। সুকুমার সেনের কোনো একটি আদি লেখা পড়ে সুনীতিবাবু মন্তব্য করেছিলেন, আপনি দেখছি বাংলা লিখতে জানেন না। এইতে রোখ চাপে, প্রমাণ করে দেবেন বাংলা লিখতে পারেন। কথাটা সুকুমারবাবু কখনও ভোলেন নি। তথ্যে এবং দৃষ্টান্তে ঠাসা সাহিত্যের ইতিহাসের খণ্ডগুলিতেও মাঝে মাঝে স্বাদু গদ্যের নজির আছে। অতবড় বিষয়কে গোছ করে তুলতে গেলে বিবরণের ভাষায় একটা ছাঁদ তৈরি করতেই হয়। কিন্তু তার মধ্যেও বিষয়ভেদে ভাষায় যে নানান বৈচিত্র্য খেলছে তা দেখানো যায়। যেমন সমাজের কথা, কালধর্মের কথা বা ইতিহাসের তথ্য যখন লেখেন তখন ভাষা বেশ জমাট। কিন্তু কোনো কাব্যের কাহিনী যখন দেন কিংবা কোনো কবির রচনার কাব্যশ্রী দেখান -- সেখানে গদ্যের সুর স্বর সজল হয়ে যায়। গল্পের টান লাগে। ছোটো ছোটো বাক্যের চলনে এক ধরনের ছন্দ আসে। ভাষার আদর্শ কেমন হবে তা নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে শুনিনি। কিন্তু এ তো সবাই জানেন, সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের রচনায়, রবীন্দ্রনাথের গানে বিভোর মানুষ ছিলেন। ভালো গাইয়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনানোর প্রতিশ্রুতিতে অনেক আপত্তি ঘুচে যেত। এ থেকে রুচি এবং মেজাজটা ধরা যায়। তার সঙ্গে মিশেছিল গল্প-কথার লৌকিক ভাষার দিকে প্রাণের টান। এ দুটি উপাদান ভিন্ন সুকুমার সেনের গদ্যের বৈশিষ্ট গড়া সম্ভব হতনা। বিশেষ করে শেষ দিকের লেখায় যুক্তির গাঁথুনি, তথ্যের সমাবেশ সত্ত্বেও ভাষায় এসেছে ত্বরিত গতি। আ-ভাঙা সংস্কৃত শব্দ সাধ্যমতো এড়িয়েছেন। পেঁচালো বাক্য একটিও নেই। সরল সহজ কথ্য চালের বাক্য প্রবাহে কখনও ঝলকে ওঠে প্রজ্ঞার দীপ্তি, কখনও-বা অনসূয় কৌতুকের ছটা। বিষয় যতই ভারি হোক, সকলের বোধ্যভাবে লেখার সচেতনতায় এবং যত্নে এই এক অনন্য-সাধারণ ভাষাশৈলী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাণ্ডিত্যের ভার ঝরিয়ে দিয়ে রচনাকে স্বাদু করে তোলায়, ভাষার রুচিরতার টানে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে টেনে নেবার নিপুণতার পেছনে অবশ্যই ছিল নিজের কালের প্রতি দায়িত্ববোধ। ছিল সংস্কারবর্জিত স্বচ্ছ দৃষ্টি, ছিল প্রগতিমুখী অনীবার আধুনিক চারিত্র।

৮

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে আমরা রয়েছি এক আঁধির মধ্যে। কালের রথ উল্টো মুখে চালানোর জিদ এবং নষ্টামি কি জয়ী হয়ে যাবে শেষ অবধি! এমন দুর্যোগে ফিরে ফিরেই মনে আসে সুকুমার সেনের মতো মুক্তমতি মানুষের কথা। তাঁর যে-কোনো রচনাই মনের আঁধি কাটাতে সাহায্য করে। আধুনিক মনন জাত একটা পরম মানবিক আশ্রয় পাওয়া যায়।

মুক্তবুদ্ধি সেই মানুষটিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে তাঁর লেখা থেকে একটু প়া যাক। 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' থেকে দুটি অনুচ্ছেদ :

"সাধারণ পাঠকদের প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে আমার এই আলোচনা চলেছে ইতিহাস-নিষ্ঠার হাঁটা পথে, ধর্মবিশ্বাসের ব্যোমযানে নয়। ইতিহাসনিষ্ঠের ও ধর্মবিশ্বাসীর যাত্রাপথ ভিন্নমুখী। ইতিহাসের পথে এগোতে হলে তথ্যের পাথেয় চাই, যুক্তির যষ্ঠি-অবলম্বন চাই। ইতিহাস-পথিক কোনো স্বতঃসিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা শুরু করেনা। ধর্মের পথে ধাবমান হলে চাই শুধু সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত প্রমাণ-নির্ভর, আর সে প্রমাণ স্বাধীন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবনার ও ধারণার বাইরে থেকে পাওয়া, তা গুরুমুখ-নিঃসৃত মন্ত্রের মতো অথবা শাস্ত্রবাক্যের মতো স্বতঃপ্রমাণ নয়। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা তথ্যের এবং যুক্তির উপর, ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসের এবং আচরণ-নিষ্ঠার উপর। ইতিহাসের প্রাণ প্রমাণের মধ্যে, ধর্মের প্রাণ প্রমাণের বাইরে। তাই ইতিহাসপন্থীর সঙ্গে ধর্মপন্থীর কোনো-ঝগড়া-বিবাদ নেই! ইতিহাস বিশ্বাস ও ধর্ম-বিশ্বাস দুইই সত্য, তবে এ একই চিন্তার স্তরে অবস্থান করেনা এবং যুগপৎ সত্য নয়।

"রামকথার প্রস্তুত আলোচনা হয়েছে ইতিহাসপন্থার অনুসরণে অর্থাৎ যুক্তির আলোয়। আমার ধর্মবিশ্বাসে 'রাম' ঈশ্বরের নামান্তর বটে। কিন্তু আমার সে ধর্মবিশ্বাসের রাম তো আমারই ভাবনায় গড়া। তাঁকে ইতিহাস ছোঁবে কি করে? যাঁরা রামকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন না, তাঁরাও তো রামকথা পড়ে-শুনে আনন্দ ও উপকার পান। এঁদের জন্যই এই আলোচনা। যাঁরা রামকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন, তাঁরা রাবণকেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু দশগ্রীব বিংশতিভুজ জীবকে হাইড্রা (Hydra) মনে করতে বাধা নেই, মানুষ মনে করতে বাধা আছে।"

বইয়ের গোড়াতেই আছে এ দুটি অনুচ্ছেদ — যার মধ্যে নিজের অবস্থান যেমন সুস্পষ্ট, একটু বাঁকা কটাক্ষে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিও খুব অস্পষ্ট নয়। আর এর আগে বইয়ের ভূমিকা শেষ করেছেন এই বলে,

"পরিশেষে প্রাকৃতজনোচিত দৃষ্টিতে রামচরিতের এই আলোচনার জন্য আমি ভক্তিপ্রাণ ধর্মাত্মাদের কাছে সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁরা এই বইটি না পড়লে আমি খুশি হব।"

এই হচ্ছেন সুকুমার সেন। ভারতীয় বাস্তবতায় মূঢ়তার দুর্যোগ ছেয়ে আছে। এমন দুঃসময়ে মনীষার এই আধুনিক চারিত্রকে মনে হয় গোটা দেশের পক্ষেই আঁকড়ে ধরার মতো এক আশ্রয়। যুক্তিবুদ্ধিস্থির-যষ্ঠি অবলম্বন করে সামনে এগোনোকে যাঁরা মনুষ্যধর্ম মানেন — তাঁদের সবারই প্রণম্য তিনি। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন, ভরসাস্থল এবং অভিভাবক ছিলেন। মৃত্যুর ফাঁক সত্ত্বেও অনেক দিন এই ভূমিকায় রয়ে যাবেন নিশ্চিত।

তাঁর উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম।

বিদ্যাসাগর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, "জীবনচরিত সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়োই ভাগ্যবান, কারণ তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার ভাই তাঁহার এক প্রকাণ্ড জীবনচরিত লেখেন। তাহার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার আরো দুইখানি জীবনচরিত বাহির হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ঘটনা ছাড় হইবার সম্ভাবনা কম। তবে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনো আসে নাই।" ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৬৫)। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয় ২৯ জুলাই ১৮৯১ খৃস্টাব্দে। এই বছরেই ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বই চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ১৩ জুন তারিখে। তৃতীয় বিদ্যাসাগর জীবনী বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' বার হয় এর চার মাস পরে। বিহারীলালের বইটির চতুর্থ সংস্করণ হয়েছিল ১৯২২ খৃস্টাব্দে। নবপত্র প্রকাশন চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে একটি দুর্লভ বই হাতে পাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বোঝাতে চেয়েছিলেন কালের দিক থেকে দূর পরিপ্রেক্ষিত না পেলে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের 'পক্ষপাতশূন্য' জীবনী লেখা সহজ নয়। বিহারীলাল সরকার কিন্তু দাবি করেছেন তাঁর দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁর আদর্শ ডক্টর স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪), যিনি মনে করতেন জীবন-চরিতে শুধু উজ্জ্বল দিক ফুটিয়ে তোলা ঠিক নয়, বিচ্যুতির দিকগুলিও সমান গুরুত্বে আলোচনা করা উচিত। বিহারীলালের ধারণা স্বয়ং জনসন তাঁর 'দি লাইভস অব দি পোয়েটস' বইয়ে সর্বদা এই নীতি অনুসরণ করতে পারেন নি, কিন্তু "সকল দোষত্রুটির সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন্ কোন্ কার্যের জনমত কিরূপ ছিল, তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। যাহার অনুকরণে সম্প্রদায়বিশেষের মহতী ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনেকে দৃঢ়-মত পোষণ করেন, তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।" (পৃ. ৪)। অর্থাৎ তাঁর আদর্শস্বরূপ জনসনের চেয়েও তিনি তিনি খাঁটি জনসনিয়ন।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের মহিমায় অভিভূত না হবার সংকল্প সত্ত্বেও আধুনিক বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাসাগরের ব্যাপক প্রভাব প্রভাব সম্পর্কে বিহারীলাল সম্পূর্ণ সচেতন। তাই বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ এবং পুরানো খবরের কাগজ ও নানা ধরনের দলিল থেকে তথ্য উদ্ধারে

তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আত্মজীবনীতে ('বঙ্গভাষার লেখক' প্রথমভাগে সংকলিত) লিখেছেন, তথ্য সংগ্রহের কঠিন পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। সে পরিশ্রমের ছাপ বইটির সর্বত্র রয়েছে। খণ্ডিতভাবে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের কোনো একটি অংশের উপরে গুরুত্ব দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্বের অখণ্ড পূর্ণ রূপটি উন্মোচন করেছেন। বইখানি সঙ্গতভাবে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর মর্যাদা পেয়েছিল। এই বড়ো পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে বিহারীলালকে দেখতে হয়েছে, জন্মের পরিবেশ থেকে কোন্ কোন্ উপাদান আকর্ষণ করে নিয়ে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিস্বরূপ প্রস্ফুট হচ্ছিল, শিক্ষাপর্বে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল কোন্ পথে, কীভাবে তিনি জীবনের মূল সংকল্পগুলি গঠন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগ ও কর্মের প্রভাব সমকালীন সমাজ-জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রতিভাবান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে নানা সামাজিক শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে গ্রহণ বর্জনের অব্যাহত প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সংহতি অর্জন করে, এই বোধ নিয়ে বিহারীলাল বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অভিব্যক্তি অনুসরণ করেছেন। তাই ঘটনার বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কাঠামোর মধ্যেই তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তথ্য সন্ধানে তাঁর পরিশ্রমের মূলে আছে এই বাস্তবতা বোধ। ঠিকুজি বিচারের ফলাফল থেকে বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত উন্মোচনের চেষ্টা, মাঝে মাঝে 'অমানুষিকী শক্তি'র কথা ভেবে ধ্রুব-প্রহ্লাদ চরিত্রের সঙ্গে তুলনা এবং 'বাল্যপ্রতিভা পূর্বজীবনের সাধনার ফল' জাতীয় মন্তব্য সত্ত্বেও বিহারীলাল দৈব-প্রেরণা বা অতি-লৌকিকত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগর-প্রতিভা ব্যাখ্যা করেন নি। নিজের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "আমরা শাস্ত্রবিশ্বাসী। শাস্ত্রের কথা মানি।" কিন্তু বিহারীলালের শাস্ত্রবিশ্বাস যতটা অলৌকিকের অভিমুখী তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক উপযোগিতামুখী। 'বিদ্যাসাগর' বইখানি পড়তে পড়তে বিহারীলালের সমাজভাবনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু মানতে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে এই মানসিকতার বাস্তব ভিত্তি ছিল। "বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুগুণান্বিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার কোনো কোনো কার্যে দোষারোপ করিতেন এবং অনেকেরই বিশ্বাস যে, সেই দোষ তাঁহার ভ্রান্তবিশ্বাস-মূলক।" (পৃ. ৩)। এই সব ভ্রান্তবিশ্বাস-মূলক কাজের সমালোচনায় বিহারীলাল শাস্ত্র-শাসিত হিন্দু সমাজের কাঠামো ভাঙার বিরোধী যে সামাজিক শক্তি - তারই প্রতিনিধিরূপে কথা বলেছেন। এ বিচারের মূল্য যাই হোক, তিনি সমাজের বাস্তব জমিতে দাঁড়িয়েই বিচার করছেন। কোনো অতিলৌকিক বিশ্বাস আশ্রয় করছেন না — বিহারী-লালের মানসিকতার এই আধুনিক লক্ষণটুকু স্বীকার করতে হয়। সমাজ-

বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিলগ্ন করে ব্যক্তিপ্রতিভার মূল্য বোঝা যায়না, এ সত্য তিনি মানেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন, আমাদের দেশের বড়ো মাপের মানুষদের বড়োত্ব মাপবার একটি ভালো মাপকাঠি বিদ্যাসাগর চরিত্র। তাঁদের পাশে একখানা বিদ্যাসাগর-জীবনী ধরলেই তাঁরা "সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।" বিদ্যাসাগরের জীবন শুধু আমাদের বড়ো মাপের মানুষদের মাপবারই মাপকাঠি নয়, তাঁর জীবনী লেখকদের ব্যক্তিত্ব এবং ধ্যান-ধারণার স্বরূপ বোঝবারও উপায়। অন্তত বিহারীলালের এই বই পড়ে এই রকম মনে হয়। বিহারীলাল বস্তুনিষ্ঠভাবে বিদ্যাসাগর চরিত্রের অসাধারণ শক্তি, ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার বাধা সত্ত্বেও নিজ সংকল্পে অটল থাকার বীর্য এবং অসামান্য মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য বিদ্যাসাগরের লেখা পাঠ্য বই 'বাসুদেব-চরিত' থেকে বাংলা গদ্যভাষার জন্মান্তর আগের লেখকদের ভাষার সঙ্গে তুলনা করে প্রতিপন্ন করেছেন। মন্তব্য করেছেন, "অনুবাদ হউক, 'বাসুদেবচরিতে' উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কি রূপে অবিকল সুন্দর অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার পথ দেখাইলেন।"

"বঙ্গভাষার যতই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক বঙ্গবাসীকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চিরঋণী থাকিতে হইবে। অবিকল অনুবাদ হইয়াছে ; কিন্তু ভাবভঙ্গ আদৌ হয় নাই।" বাংলা গদ্যের বিকাশে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্দেশের সঙ্গে বিহারীলাল অবশ্য একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন, "খৃস্টান সাহেবেরা এ পুস্তকের অনুমোদন করেন নাই ; তজ্জন্য দুঃখ নাই ; দুঃখ এই, একখানি সুপাঠ্য পুস্তকে হিন্দু সন্তানেরা বঞ্চিত হইয়াছেন ; দুঃখ এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপে ভগবানের অবতারত্ব প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই।" (পৃ. ১১৩)। এই রকম খেদের ভেতর দিয়েই ক্রমে বিহারীলালের মানসিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রযত্নের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক দেখান 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ' শ্লোকের তাৎপর্য বিদ্যাসাগর একেবারেই ভুল বুঝেছিলেন। "আমরা অধম হিন্দু এখনও এই বুঝি, আমাদের পূর্বতন রমণীরা যে শিক্ষায় অন্নপূর্ণারূপে কীর্তিমতী হইয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষা এই শ্লোকের উপপাদ্য। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণা, যাহাতে এই পরকালের কর্তব্য সাধন হয়, তাহাই হিন্দু রমণীর শিক্ষণীয়। লেখাপড়া না শিখিয়া হিন্দু রমণীরা যদি সে কর্তব্যসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে বলিব, তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। ··· যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, লেখাপড়া শিখিলে হিন্দুর সংসার সুখময় হইবে। ··· বিদ্যাসাগর

মহাশয়, যাহা ভাবিয়া যাহা করুন, ফলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখায় এ মুহূর্তে গরল উদ্‌গীর্ণ হইতেছে।" ব্যঙ্গ করে বৈষ্ণব পদ তুলেছেন "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল"। (পৃ. ১৫৩)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে শূদ্র ছাত্র নেবার ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিহারীলাল বাঁকা মন্তব্য করেন. "সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হয়। কর্তৃপক্ষের যাহা মনোগত, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরর প্রস্তাব তাঁহাদের মনোনীত না হইবে কেন ?"

একমাত্র ছেলে নারায়ণের বিধবা-বিবাহ সমর্থনে বিদ্যাসাগর মশায় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙমুখ নহি।" বিহারীলালের বইয়ের সপ্তদশ অধ্যায়ের শিরোনাম "বিধবা-বিবাহ"। শিরোনামের পাশেই তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লিখেছেন. "হিন্দু রমণীর একবার বিবাহ হইবার পর আর বিবাহ হইতে পারে না। হিন্দু বিবাহের পবিত্রভাব হিন্দু বুঝে। হিন্দু স্ত্রী-স্বামীর সম্বন্ধ ইহ পরকালের। হিন্দু রমণীর পতিবিয়োগের পর বিবাহ হইতে পারে না ; সুতরাং 'বিবাহ' কথার প্রয়োগ করা চলে না। আজকাল 'বিবাহ কথা' চলিয়া গিয়াছে, তাই সেই কথা রহিল। এ বিবাহ হিন্দুর বিবাহ নহে।" (পৃ. ১৭৩)। বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর ব্যক্তিত্বের এবং মেধার এবং বিত্তের যা-কিছু সম্বল একাগ্র করে এই একটি ক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষায় নেমে ছিলেন। বিধবা-বিবাহ চালাতে তিনি সফল হয়েছিলেন কিনা সেটা বড়ো বিবেচ্য নয়। এই উদ্যোগে সংকল্প গঠন এবং সেই সংকল্প কার্যকর করার পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের পুরুষার্থ অব্যর্থ অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। তাঁর জীবনী লেখকদের পক্ষে এই পর্বটি তাই সবচেয়ে বড়ো সংকটের জায়গা। বিহারীলাল অধ্যায় সূচনাতেই ওই পাদটীকায় একটি অটল অবস্থানে দাঁড়িয়েছেন। বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর এবং তাঁর প্রতিপক্ষের যুক্তি নিরপেক্ষভাবে বিচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। 'বিধবা-বিবাহ' শব্দটির গঠনই তাঁর মতে অবৈধ। হিন্দু আচার ও বিশ্বাসের পরিপন্থী বলেই অবৈধ, অন্য যুক্তি এঁর গ্রাহ্য নয়। তিনি দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগরের আগেও বিধবা-বিবাহ চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ঢাকার রাজা রাজবল্লভ, মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ, মতিলাল শীল এবং পটলডাঙা নিবাসী কর্মকার জাতীয় শ্যামাচরণ দাস বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু "ব্রাহ্মণ পরিচালিত হিন্দুর প্রাধান্য জন্য" বিধবা-বিবাহ চলেনি। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় প্রাজ্ঞ পণ্ডিত" চেষ্টা করলেও "যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, যাহা দেশাচার বহির্ভূত তাহা কোটি কোটি অর্থব্যয়েও সাধারণে প্রচলিত হয় কি ?" (পৃ. ১৮০)। বিহারীলাল নিজে বিদ্যাসাগর মশায়ের

যুক্তি খণ্ডন করেন নি, বিরুদ্ধ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের এবং 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার উদ্ধৃতির উপরে প্রধানত নির্ভর করেছেন।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বপৎসু নারীণাং পতিরন্যা বিধীয়তে।"

বিদ্যাসাগর 'পরাশর সংহিতা'র এই শ্লোকটির অর্থ করেছিলেন, "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।" এই অনুবাদ যে ঠিক পঞ্চানন তর্করত্ন তা স্বীকার করেছেন। করেও বলেছেন, "এ বচনের ইহাই অনুবাদ, কিন্তু এই বচনের অনুমতি রক্ষা বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ।" আর 'বঙ্গদর্শন' থেকে তোলা অংশের যুক্তি এই রকম, "বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য, এমত আমাদের বোধ হয়না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয়, অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচজন বিধবার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র সহস্র লোকের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত। · আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এই জন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি, — ন্যায়পরতার উগ্র মূর্তি আমরা সহ্য করিতে পারিনা; সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভব শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকে স্পেনসার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।" (পৃ. ১৮৫)। বিদ্যাসাগরের দয়াপ্রবণতা এবং নরম প্রকৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ ভিন্ন যুক্তি কিছুই নেই এই লেখায়। কিন্তু বিহারীলালের অনুজ্ঞা, এ লেখা "সমাজহিতাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত"। প্রবল বাধা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে যাবার কারণ, তাঁর মতে, বিদ্যাসাগরের এক মোক্ষম কৌশল। 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটি তিনি তাড়াতাড়ি ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছেপে দিয়েছিলেন। ফলে সহজেই ইংরেজ রাজপুরুষদের মন গলে গেল। যে সংকল্পকে বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম মনে করতেন, জীবনী-লেখক সেই সংকল্পের তাৎপর্য বুঝবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। রায় দিয়েছেন, "অকার্যেও চরম আত্মোৎসর্গ। ভ্রমেও লাঞ্ছনা-তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না।" এবং নিজের বিচার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব অভিমানে আহ্বান জানিয়েছেন,"হিন্দু সন্তানকে বলি, বিদ্যাসাগরের ভ্রমে ভুলিও না।" 'ভ্রান্তবিশ্বাসের' বশে বিদ্যাসাগরের অমিত শক্তির অপচয় নিয়ে কাতর আক্ষেপে বইয়ের 'বিধবা-বিবাহ' অধ্যায় শেষ করেন: "হায়! হিন্দুর করণীয় কার্যে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা — এই একাগ্রতা পরিচালিত হইলে, আজি হিন্দু-সমাজ যে অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অনেকটা "গতিরোধ হইত"। (পৃ. ২০৯)

এই বইয়ে বিদ্যাসাগরের আর একটি উদ্যোগ, বহু-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত। কারণ এ বিষয়ে আইন পাস করাতে না পারায় 'অমঙ্গল' বেশি দূর গড়ায় নি। "এ সম্বন্ধে আইন যে হয় নাই, ইহাই দেশের মঙ্গলের বিষয়।" (পৃ. ৩১৩)। আর বহু-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকার ইংরেজি অনুবাদও যে বিদ্যাসাগর করে উঠতে পারেন নি তাতে লেখক বেশ খুশি। কিন্তু বহু-বিবাহ সম্পর্কে লেখা প্রথম পুস্তিকা সম্পর্কে বিহারীলালের মন্তব্য। "কলিযুগে অসবর্ণ বিবাহ রহিত হইয়াছে ; সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। একথার শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা লইয়া কোনও বিচারও উত্থাপিত হয় নাই।" — একেবারেই সত্য নয়। "প্রথম আপত্তি" অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় বিধান বিচার করেছেন, সর্বত্র প্রয়োজনে পাদটীকায় শাস্ত্রের সূত্র নির্দেশ করেছেন। আসলে এই লেখাটি অত্যন্ত ধারালো এবং তথ্যপ্রমাণে ঠাসা। প্রবন্ধটির মধ্যে ফাঁক বার করা বিহারীলালের সাধ্যে কুলোয় নি। বহু-বিবাহ রোধ সম্পর্কে সরকার কোনো আইন তৈরিতে যে উৎসাহ বোধ করেননি তার কারণ সিপাহি বিদ্রোহের ধাক্কায় সতর্ক বিদেশি শাসকেরা এদেশের সামাজিক ব্যাপারে হাত দেওয়া আর যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। একটি তথ্য বিহারীলাল উল্লেখ করেন নি। বাংলা সরকার বহু-বিবাহ সম্পর্কে আইন করা উচিত কিনা বিবেচনার জন্য একটি কমিটি বসিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর কমিটির সদস্য ছিলেন। বেশির ভাগ সদস্যের মত অনুযায়ী কমিটি আইন করা উচিত নয় বলে সুপারিশ করে। বিদ্যাসাগর এই সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

বিহারীলালের মতাদর্শগত অবস্থান বিদ্যাসাগরের বিপরীত মেরুতে। আমাদের দেশের আয়তন এবং দেশবাসীর সংখ্যার তুলনায় খুবই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে রামমোহনের সময় থেকে যুক্তিবুদ্ধি নির্ভর সংস্কার আন্দোলন কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূলে ছিল মানবিক বিচারবুদ্ধি। বাধা ছিল প্রবল। মূল্য ও প্রয়োজন ক্ষয়ে যাওয়া সামাজিক প্রথা যাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আঁকড়ে ছিলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তবুদ্ধি মানুষেরা তাঁদের প্রতিরোধ ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টায় অচলায়তনে চিড় ধরিয়েছিলেন। সেই পথটুকু দিয়ে আমদের সমাজে আধুনিকতার আভাস এল। বিহারীলাল সরকার মনে প্রাণে অচলায়তনিক। তিনি ছিলেন যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর (১৮৫৪-১৯০৫) 'বঙ্গবাসী' প্রেসের কর্মী, পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর মাসিক পত্রিকা 'জন্মভূমি'তে তাঁর এই বিদ্যাসাগর জীবনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। তখন 'জন্মভূমি'র সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন। 'বাঙ্গালী চরিত' বইয়ে যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু লিখেছিলেন, "ম্লেচ্ছ অধিকারে 'স্ত্রী-শিক্ষা' নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এদেশে আমদানি হইয়াছে! এই 'স্ত্রী-

শিক্ষাই সর্বনেশে জিনিস; তেঁতুল কেউটের বিষ।" বিহারীলাল এই দৃষ্টি থেকেই বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন। হিঁদুয়ানির দুর্গরক্ষী বিহারীলালের পক্ষে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব ছিল। তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কেন বিদ্যাসাগর বলেন, "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।"

কখনও কখনও বিহারীলালের আলোচনা পদ্ধতিতে অবশ্য বেশ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় ফোটে, যেমন বিদ্যাসাগর মশায়ের সাহিত্যিক কৃতিত্ব বিচারে। কিন্তু সেখানেও তাঁর দুর্মর হিঁদুয়ানির ছায়া পড়ে। 'শকুন্তলা' বইটির আলোচনা শেষ করেন এইভাবে: "শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহাকে সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব প্রদত্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিশক্তি বা ব্রাহ্মণ্য মহিমা বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?" (পৃ. ১৭৩)।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিহারীলাল অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। আগাগোড়া শ্রদ্ধাবোধের ঠাট বজায় রেখে লিখেছেন। কিন্তু খাঁটি জনসনিয়ন হবার অভিমানে যে সমালোচনা করেছেন তা সাধারণ শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার চেয়ে গুরুতর। তিনি সেই পথগুলিই রোধ করতে চান যে পথে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-শক্তির প্রভাব মুক্তবুদ্ধির প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। এবং এটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত নয়, সমাজপতিদের মুখপাত্র হয়েই তিনি কথা বলেন। এই কারণে 'বিদ্যাসাগর' বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কোন্ শক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে লড়তে হয়েছিল বুঝতে এই জীবনী সাহায্য করে।

এ ধরনের বই পুনর্মুদ্রণের সময়ে যোগ্য হাতে সম্পাদনার ব্যবস্থা কর উচিত। দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার মতো অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'ভ্রমনিরাস'-এ এবং ইন্দ্রমিত্রর (অরবিন্দ গুহ) গবেষণায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। বিহারীলাল যেসব তথ্য ব্যবহার করেছেন, কোথাও কোথাও তার পরিপূরক তথ্য দেওয়া যেত। তাতে আলোচিত বিষয়ের তাৎপর্য স্পষ্ট হতে পারত। ইদানীং রচনাবলি এবং পুরানো বই অনেক ছাপা হল, কিন্তু বইপাড়ার কোনো ঘরেই এ জাতীয় প্রকাশনায় নিম্নতম দায়িত্বচেতনা দেখা যায়নি। এই বইখানির শেষে একটি অনুক্রমণীও নেই। আছে শুরুতে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তের লেখা একটি সাম্পাদকীয় টিপ্পনী। তাতে নাম না করে বিহারীলাল সরকারের আর একখানি সম্প্রতি ছাপা বইয়ের (ভিতুমীর?) সম্পাদক সম্পর্কে চোখা চোখা মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু সনৎবাবু যে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের

মহাপ্রয়াণের পর বিহারীলাল সরকারই (১৮৫৫-১৯১১ খৃ.) প্রথম সাগর তর্পণে এগিয়ে আসেন এক বৃহৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে।" — এটা কি ঠিক কথা ? শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগর মশায় বেঁচে থাকতেই তাঁর জীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। সে লেখার কিছু অংশ বিদ্যাসাগর মশায় দেখে অনুমোদনও করেছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের বই তো ছাপা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে। 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বিহারীলালের লেখা যদি তখন প্রকাশ শুরু হয়েও থাকে নিশ্চয়ই বিশেষ এগোয় নি। একই সময়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বৃহৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে'ই কাজ করছিলেন এবং তাঁর 'বিদ্যাসাগর' বিহারীলালের বইয়ের আগেই ছাপা হয়েছিল। বিহারীলালের মৃত্যু কি ১৯১১ খৃস্টাব্দে ? বাংলা তারিখ পাচ্ছি ৯ ফাল্গুন ১৩২৮। কিছুতেই ১৯১১ খৃস্টাব্দ হতে পারেনা। এটি ছাপার ভুল হতে পারে. কিন্তু এই ভুল বা বইয়ের ভেতরের আরও অনেক ভুল কোনো শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করা হয়নি।

প্রদোষ দাশগুপ্ত
স্মৃতিকথা শিল্পকথা

দুই বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্য কালে ভাবনায় এবং কাজে আমাদের শিল্পের ভুবনে যে আলোড়ন আর পরিবর্তন ঘটেছিল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়ার ভরসায় তিরিশের চল্লিশের দশকের শিল্পীদের কথা আমরা শুনতে চাই। এই সময়ের খুব কিছু লেখা আজও হাতে আসেনি তেমন। ১৯৩০-৪০-এর দশকে ছাত্র বয়স পেরিয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চিন্তামণি করের 'স্মৃতিচিহ্নিত' (১৯৫৩) আর নীরদ মজুমদারের 'পুনশ্চ পারী'র (১৯৪৩) পরে সম্প্রতি প্রকাশিত হল প্রদোষ দাশগুপ্তের 'স্মৃতিকথা শিল্পকথা/ক্যালকাটা গ্রুপ' বইটি। আজ তাঁর বয়স পঁচাত্তর। অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং শিল্পকীর্তির মূল্যগৌরবে মর্যাদাবান্ এই শিল্পীর বই সম্ভ্রমেই হাতে তুলে নিতে হয়।

আত্মস্মৃতির ধরনে লেখা নয় বইটি। যুগান্তর পত্রিকায় টুকরো টুকরো নিবন্ধ লিখেছিলেন — সেইসব নিবন্ধ বইয়ে আনা হয়েছে। ক্যালকাটা গ্রুপের ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে ওই গ্রুপের উদ্ভব-বিকাশ-বিলয়ের প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সম্পর্কে প্রদোষবাবুর একান্ত ব্যক্তিগত অবলোকন বইয়ের বিষয়। ভূমিকায় লেখকের কথা, "আমার সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রুপের পরিচয় তার উৎস থেকেই এবং ক্যালকাটা গ্রুপে শেষ দিন পর্যন্ত আমি অবিচ্ছেদ্যভাবে এই গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সুতরাং আমাকে বাদ দিয়ে আমি গ্রুপের কথা ভাবতেই পারিনা এমনই একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব আমার সঙ্গে গ্রুপের গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে আমি খুব গর্ববোধ করি যে একদিনের জন্যও গ্রুপের সঙ্গে আমি আমার সম্বন্ধ ছেদ করিনি কিংবা ছেদ হবার কোনো কারণ ঘটাই নি (পৃ. ৯)।" ক্যালকাটা গ্রুপের "উৎস বীজরোপণ, অঙ্কুরোদগম, সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, বিরুদ্ধ মতবাদ, বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা ও সাহচর্য, ক্রমোন্নতি এবং পরিশেষে ফলপ্রসব ..." সমস্ত পর্যায়ের সঙ্গে যে প্রদোষবাবুর "নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, এবং নিজস্ব মতামত" ওতপ্রোত — এই দাবি প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। শারদীয় (১৩৯১) অনুষ্টুপ পত্রিকায় শোভন সোম-এর "ক্যালকাটা গ্রুপ (১৯৪৩-১৯৫৩): উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও পরিণাম" নামে একটি লেখায় গ্রুপ গড়ে তোলায় প্রদোষবাবুর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। তার প্রতিক্রিয়া বর্তেছে প্রদোষবাবুর গোটা বইয়ে। বইখানিতে অজানা খবর, মূল্যবান অবলোকন এত আছে, যার গৌরব জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই তাঁকে দেবেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার আত্মপ্রশস্তির বাহুল্য বড়ো অস্বস্তিকর।

আমাদের আধুনিক শিল্পের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের ভূমিকার গুরুত্ব এক মান্য ইতিহাস — যা উপেক্ষা করে শিল্পে ভারতীয় আধুনিকতার বিচার কোনো ভিত পায়না। উত্তর প্রজন্মের মানুষ প্রদোষবাবু পূর্বজদের কাজকর্ম সম্পর্কে কী ভাবেন? তাঁর বই থেকে পৃষ্ঠা উল্টে পাল্টে একটু পড়া যাক :

"আমাদের শিল্পের ইতিহাস তো ফাঁকে ভর্তি। এই ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারার কথা আমাদের জানা নেই। ··· পুরনো ক্লাসিক্যাল যুগের কথা বাদ দিলেও আমাদের শিল্প ইতিহাসের শেষ অধ্যায়েও তো আমরা মস্ত বড় ফাঁক দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়ওয়ালের পাহাড়ী শিল্পী মোলারামের পর শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে দ' পড়েছে এটা তো ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে আছে। এই যে অনুর্বর শিল্পক্ষেত্রের ফাঁক, এর পরেই দেখা গেল বেঙ্গল স্কুলের প্রচেষ্টা ভারতীয় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই চেষ্টা ফলবতী হলো না। গেল আরো ৪০ বছর। সুতরাং বিশৃঙ্খলা তো আসবেই এবং থাকবে যতদিন না নতুন করে আবার আমাদের শিল্পকে নতুন ছন্দে, নতুন রূপে জাগিয়ে তুলতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, অমৃতা শেরগীল এবং ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা সেই নতুন ছন্দে, নতুন রূপে আমাদের জাতীয় শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র।" (পৃ. ৫১)।

"সন্দেহ নেই, এই বিরাট ম্যুভমেন্ট (বেঙ্গল স্কুল) সম্ভব হয়েছিল আমাদের তৎকালীন রাজনীতিমূলক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সাধারণ মানুষ তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনাধীনে পর্যুদস্ত। তাই তারা তখন নিজেদের দেশ এবং নিজস্ব শিল্প এবং কৃষ্টির সম্বন্ধে ভাবতে শিখল কোনো শিল্প-প্রেরণার অনুজ্ঞায় নয়, নিছক রাজনীতির খাতিরে অথবা স্বদেশী মন্ত্রের উত্তেজনায়। তারা তখন একবারও ভেবে দেখল না রিভাইবেলিজম পুষ্ট নতুন স্বদেশী আর্টের পরিকল্পনা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ কিনা এই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, এই আধুনিক সভ্যতার যুগে, এই নতুন পরিবেশে। তারা একবারও ভেবে দেখল না যে দেব-দেবীর ধ্যানধারণা কিংবা ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে ধার করা বিষয়বস্তু এ যুগে অচল। পরন্তু, এই নতুন সভ্যতার যুগে তার নতুন সামাজিক পরিবেশে 'মানুষ'কেই প্রাধান্য দিতে হবে ; এবং এই 'মানুষ'কে ঘিরেই সমস্ত শিল্প রচনার ও শিল্প অভিব্যক্তির রুচিজ্ঞান গড়ে উঠবে। ন্যূনাধিক চাল্লিশ বৎসরকাল আমাদের শিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এই মস্ত বড়ো ফাঁক তৈরি হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। কেউ তখন এগিয়ে আসেনি এই ফাঁককে বোজাবার চেষ্টায়। (পৃ. ৩৩)।"

প্রদোষবাবুর তথ্যরিক্ত এই মন্তব্যে দুটো বড়ো বড়ো ফাঁক। ভারতীয় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের ঝোঁক বেঙ্গল স্কুলের গোড়ার দিকে দেখা গেলেও গোটা আন্দোলন

সেই জায়গায় অবিচল দাঁড়িয়ে থাকেন নি। "ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসরকাল", মানে, ক্যালকাটা গ্রুপের অভ্যুদয়ের আগের চল্লিশ বছর একাকই পণ্ডশ্রমে গেছে — এমন মন্তব্য শুধু অবনীন্দ্রনাথের কাজের বিকাশ স্মরণ করলেই খারিজ হয়ে যায়। দ্বিতীয়, কথা, শিল্পের প্রেরণা আদৌ ছিলনা, শুধু রাজনীতির 'খাতিরে' মানুষের মন শিল্পে আগ্রহী হয়েছিল — এও কোনো ন্যায্য বিশ্লেষণ নয়। স্বদেশি উদ্দীপনায় আমাদের শিল্পকলা পুষ্টি পেয়েছিল, ঠিক। ইতিহাসে দেখি, প্রাথমিক সেই স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা ক্রমে নানানখানা হয়ে সংকটের পর সংকটে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই উদ্দীপনার তাপউত্তাপে সাহিত্যের, গানের, ছবির সৃষ্টিকাজে কিছু মানুষ যে নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের স্বাদ পেলেন, সংকল্প গঠন করতে পারলেন, এও তো ইতিহাসেরই সত্য। উত্তাল স্বাদেশিকতার ঢেউ কেটে গেল। রইল বিশৃঙ্খল রুচির ঘোলাটে পরিবেশে ঐতিহ্যস্মৃতি এবং আধুনিক বর্তমানের মধ্যে বোঝাপড়ার দায়। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল বসুর শিল্পী-ব্যক্তিত্বের পৌরুষ ধারণায় আনতে হলে এইখানটায় দাঁড়িয়ে এঁদের কাজের বিকাশ লক্ষ করতে হয়। সে ধৈর্য অবশ্য প্রদোষবাবুর কাছে আশা করা যায়না। তিনি কোনো রীতিমতো গবেষণার দায়িত্ব নেননি।

বেঙ্গল স্কুল আর ক্যালকাটা গ্রুপের মাঝের স্তরে প্রদোষবাবু গগনেন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ এবং অমৃতা শের-গিলকে রেখেছেন। এঁদের বলেছেন, "নতুন যুগের পথপ্রদর্শক"। ১৯২১ থেকে ৪০ — দশক দুটিতে আমাদের শিল্পে আবার নতুন ভাবনার ঢেউ জাগছিল। অবনীন্দ্রনাথ যে স্তরে স্তরে নিজেরই রীতিপদ্ধতি ভেঙে ভেঙে এগিয়েছেন ক্রমাগত — তাঁর অনুগামীদের অনেকেরই বোধে সে শিক্ষাটা বর্তায় নি। ১৯২৫ নাগাদ অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বাংলা ঘরানার আত্মপ্রসাদে বিরক্ত বোধ করেন। বলেন, "জাতির ফুঁয়ে জাতীয়তার গৌরব জ্বলে কিন্তু ফুলের মুখ খোলেনা"। ('জাতি ও শিল্প', ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। অবনীন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়া প্রদোষবাবু লক্ষ করেন নি। শিল্পে জাতীয়তা-ত্বের তীব্র সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। নতুন পথের নীরস পরীক্ষায় গগনেন্দ্রনাথ নতুন জমি তৈরি করে তোলেন। জটিলতর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় ফোটে যামিনী রায়ের কাজে। আর, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রদোষবাবুর মন্তব্য যথার্থ, "তাঁর জোরালো রঙ-এর ব্যবহার এবং সুস্পষ্ট ফরম-এর অবতারণা ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে রুচিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এক নতুন মাপকাঠির সন্ধান দিল"। (পৃ. ৩৯)। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানের সময়ে শিল্প-সাহিত্যের গোটা এলাকাতেই একটা বড়ো বাঁক এসেছিল। সেই হাওয়ার গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারা-না-পারায় শিল্পী-সাহিত্যিকদের কালচেতনার মাত্রা ধরা যায়।

শিল্পীর দায় তো বর্তমানেরই কাছে। বাস্তব যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তার সঙ্গে বোঝাপড়ার দায় এড়িয়ে কোনো শিল্পীর উদ্ধার নেই। তাই দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ ক্রমেই যখন ঘোরালো হয়ে উঠছিল, সভ্যতার সর্বনাশের মুখে প্রতিরোধে নানা মত নানা পথের শিল্পী সাহিত্যিকেরা জোট বাঁধছিলেন, সেই কঠিন সময়ে ভারতের, বাংলার সংস্কৃতিলোক আলোড়িত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। নীতিগত ভাবনার স্তরে যেমন, তেমনি বাস্তবে ভারতীয় পরিস্থিতির জটিলতা অন্তহীন। ইংরেজ তখন লড়ছে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে, আবার সেই ইংরেজই ভারতের বুকে এক নির্মম শোষণতন্ত্র চাপিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে, বিশেষ করে বাংলায় ঘটানো হল মন্বন্তর। আজ সে ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিলে সেদিনের সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকা নিয়ে গৌরব বোধ হয়। অত সংকট, অত সন্তাপের মধ্যেও পরিস্থিতির মূল্যায়নে তাঁরা অভ্রান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ করায় কমিউনিস্ট-নেতৃত্ব ইতিহাসের সত্য। সোমনাথ হোর, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, জয়নুল আবেদিনের মতো ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরাও প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সেই আন্দোলনের প্রভাবে এসেছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য পেয়েছিলেন। আপৎকালে সংহতি গড়ে তোলায় নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়। সে সময়ে দেশে দেশে যেমন, তেমনি আমাদের এখানেও কমিউনিস্ট কর্মীরা নেতৃভূমিকায় এসেছিলেন। এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ক্যালকাটা গ্রুপের পত্তন এবং বিকাশের কথা বলতে গেলে সেদিনের সে পরিস্থিতির প্রসঙ্গ আনতেই হয়। প্রদোষবাবুও বলেছেন,

"এই-সব দিনগুলো বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তখন বাংলার বুকে চেপে বসেছে। এই অসম্ভব, হৃদয়হীন অমানুষিক পরিস্থিতি আমাদের ক্যালকাটা গ্রুপের সভ্যদের প্রবলভাবে নাড়া দিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কি কম্যুনিজম্-এর গণ্ডির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এই নিদারুণ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভ জানাতে। অন্যান্য শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং ফলে প্রায় এই একই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন' এবং 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' জন্ম নিল অনেক নামজাদা বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহানুভূতি নিয়ে। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন নামকরা সব লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, নর্তক, সংগীতজ্ঞ এবং ছায়াচিত্রকর। এই ভাবে বাংলার দ্বিতীয় রেনেসাঁসের সূচনা হলো যেন হঠাৎই এই অভাবনীয় পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে নতুন এক শিল্প বিপ্লবের আন্দোলনে।" (পৃ. ৩৯-৪০)।

তাঁর লেখায় আরও স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে,

"প্রথমত, আমাদের গ্রুপের সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই সহযোগিতা দিয়েছেন বেশি তাঁদের পত্র-পত্রিকায় আমাদের কার্যকলাপের প্রচার এবং প্রশংসা

করে। আর, দ্বিতীয়ত, আমাদের গ্রুপের বম্বে প্রদর্শনীর (১৯৪৫) ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটারের উদ্যোগে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রেরণায়।" (পৃ. ৯৮)।

যে কারণেই হোক, কমিউনিস্টদের উপরে প্রদোষবাবুর ভয়ানক রাগ। ফলে মহা-সংকটে পড়েছেন। সমকালীন পরিস্থিতির বিবরণে তাঁকে কমিউনিস্টদের সহায়তার কথা মানতে হচ্ছে, কিন্তু, আর যে-যাই-করুক তিনি নিজে সে ছোঁয়াচ বরাবর বাঁচিয়ে চলেছেন প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তাঁর বিবরণ থেকেই বেরিয়ে আসছে, ক্যালকাটা গ্রুপের অনেকেই কমিউনিস্টদের সহযোগী ছিলেন। সুভো ঠাকুর এবং রথীন মৈত্র তো ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কলা বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। (পৃ. ১৩৪)। আবার রথীন মৈত্র প্রদোষবাবুর সঙ্গে ক্যালকাটা গ্রুপের যুগ্ম-সচিব হন। তবুও বার বারই জোর দিয়ে বলছেন, ক্যালকাটা গ্রুপকে তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতির সংস্রবের বাইরে রেখেছেন "এ বিষয়ে আমাদের মতামত খুব পরিষ্কার ছিল যে, আমরা কোনো দলে ভিড়ব না, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলে (পৃ. ৯৮)। এই "আমরা"টা তা হলে কারা ? প্রদোষবাবু গ্রুপের উপের যে কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব দাবি করছেন সত্যি কি তেমন কোনো সাংগঠনিক নেতৃত্ব তাঁর ছিল ? আসলে ক্যালকাটা গ্রুপ তো একটি বন্ধু সমাবেশের মতো ব্যাপার, অবশ্যমান্য কোনো নীতি বা আদর্শের সূত্রে গড়ে ওঠা সংগঠন ছিলনা। তাই প্রদোষ দাশগুপ্ত মশায়ের ব্যক্তিগত ঝোঁক এই বন্ধুগোষ্ঠীর অন্য সদস্যদের উপরে চাপাতে গেলে খাপে খাপে মেলেনা।

যুদ্ধের, মন্বন্তরের ধাক্কায়, য়ুরোপে শিল্পের আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষার নজির সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসারে সে সময় যে নতুন চেতনার ঢেউ জাগছিল তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আন্তর্জাতিক শিল্পের বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়াবার আগ্রহ। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য — এ রকম দেওয়াল-তোলা ভাগ মেনে চলবার উপযোগিতা তখন ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু পশ্চিমি হাওয়াই প্রাচ্যকে উতল করে তোলে এও তো সত্য ছিল না আর। জাপানি ছাপা ছবির নমুনা পশ্চিমি চিত্রকলায় রঙের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে নতুন ভাবনা জাগিয়েছিল। আফ্রিকার আদিম ভাস্কর্যের ধারা পশ্চিমি ভাস্কর্যে শিল্পমুক্তির নতুন ইঙ্গিত বয়ে আনছিল। প্রদোষবাবু উল্লেখ করেছেন, কনস্ট্যানটাইন ব্রাঁকুসি (১৮৭৬-১৯৫৭) ভারতীয় ভাস্কর্যের মর্ম বোঝার আগ্রহে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর সংগ্রহে ছিল কালীঘাটের পট। রোদ্যাঁর (১৮৪০-১৯১৭) ভারতীয় নটরাজ মূর্তি সম্পর্কে মুগ্ধতার কথাও মনে আসে। ১৯১৩ সালে রোদ্যাঁ 'লা দান্স দা শিব' ('শিবের নৃত্য') নিবন্ধে লিখেছিলেন, নটরাজ মূর্তির "পুরো ভঙ্গিটাই প্রাকৃতিক, অথচ প্রকৃতিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কত তফাতে ! .... এই যে ডৌল, এর অন্তরে রয়েছে লাবণ্য ; লাবণ্যকে সর্বত্র ধারণ

করে আছে মডেলিং ; আর এই সমস্ত কিছু ধরতে চায় এমন একটি শব্দকে যাকে বলতে পারি মাধুরী, কিন্তু এ মাধুরী বীর্যবান, উদাত্ত ! এর পর ··· কথায় আর কুলোতে পারছি না আমি ···' (অনুবাদ : প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, 'প্রতিক্ষণ'— সংস্কৃতি সংখ্যা ১৩৯৪)। প্রাচ্যের হাওয়াও যে এমনি ভাবে পশ্চিমের শিল্পীদের ভাবনায় ঢেউ তুলেছিল — সচরাচর এটা হিসেবের মধ্যে রাখা হয়না। গোটা বিশ্বেই শিল্পের চরিত্র বদল, ভাষা বদল ঘটে চলেছিল। আমাদের শিল্পে "দ্বিতীয় রেনেসাঁস" আসে এই ধারাতেই। প্রদোষবাবু ঠিকই দেখিয়েছেন, গগনেন্দ্র-যামিনী রায়-অমৃতা শের-গিলএ সেই বাঁকটা স্পষ্ট। স্পষ্টতর, চিত্রকর রবীন্দ্র-নাথের প্রবল আবির্ভাবে। এ ইঙ্গিত যাঁরা বুঝেছিলেন, ভারতীয় শিল্পে আধুনিক প্রগতির মূল স্রোত বহমান রাখা তাঁদেরই কৃতিত্ব। প্রদোষবাবু নিজেকে নিয়ে এমন ১৪ জন শিল্পীর কাজের পরিচয় দিয়েছেন। ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে কোনো ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন না — এমন সমকালীন শক্তিমান শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এ বইয়ের পরিকল্পনায় তাঁদের কথা আনা যায়না। তাঁরা তাই প্রদোষবাবুর অবলোকনের বাইরে রয়ে গেছেন। এই ১৪ জনের মধ্যে মাত্র তিন জন — রামকিঙ্কর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্ত (প্রদোষবাবুর স্ত্রী) ভাস্কর, আর সকলে চিত্রকর। রামকিঙ্কর অবশ্য ক্যালকাটা গ্রুপের ভেতরের মানুষ হয়ে ওঠেন নি কখনও।

প্রদোষ দাশগুপ্ত মশায় বার বার আদর্শের বাঁধুনির কথা তুলেছেন। একটু দূরকালের মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে ১৯৪০-এর দশকের তরুণ শিল্পীদের কাজে তাঁদের বাস্তবতাবোধের এবং প্রকাশশৈলীর বৈচিত্র্যের দিকটিই বেশি করে চোখে পড়ে। রথীন মৈত্র আর পরিতোষ সেন বা নীরদ মজুমদার আর প্রাণকৃষ্ণ পালের কাজের সংবেদনে মিল নেই কোনো। গোপাল ঘোষকে তুলনা করব কার সঙ্গে ? এই বৈচিত্র্য, পরস্পর থেকে আলাদা পরীক্ষার জগৎ তৈরি করার এই ক্ষমতায় প্রকাশ পেয়েছিল তখনকার পরিবেশের তরুণ শিল্পীদের ভরপুর প্রাণশক্তি। প্রগতির মূল ধারা যাঁরা চিনেছিলেন তাঁরাই এই প্রাণময়তার পরিচয় দিতে পারলেন। আদর্শের নির্দিষ্ট বাঁধুনি নয়, একটা ঝোঁকের ঐকসূত্র শুধু পাওয়া যায় এঁদের মধ্যে। আধুনিকতার এই বৈশিষ্ট্য ক্যালকাটা গ্রুপের বাইরেও অনেক শিল্পীর মধ্যে লক্ষণীয়। প্রদোষবাবুর বইয়ের মধ্যে ছড়ানো মন্তব্য সূত্রবদ্ধ করে বলা যায় এ সময়ের শিল্পীরা—

১. রূঢ় অভিজ্ঞতার ধাক্কায়, যুদ্ধের-মন্বন্তরের অভিজ্ঞতায় সাক্ষাৎ বাস্তবে মানুষের সমস্যার দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়েছিলেন ;

২. আধ্যাত্মিকতা নয়, ধর্ম নয়, পরিস্থিতির অস্বাভাবিক চাপে যন্ত্রণাকাতর মনুষ্যত্বকেই শিল্পের একান্ত বিষয় বলে মেনেছিলেন ;

৩. উপলব্ধি করেছিলেন, শিল্পের আঙ্গিকে কোনো জাতীয় বিজাতীয় ভেদ

চলে না। আন্তর্জাতিক আধুনিকতার বড় রাস্তায় উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন শিল্পীর চরিতার্থতা অসম্ভব ;

৪. মেনেছিলেন, ছবি বা মূর্তি দাঁড়াবে ছবির বা মূর্তির নিজস্ব শিল্পগুণে, শিল্পচরিত্রে। কোনো গল্পের বা নীতিকথার অনুষঙ্গে নয়। শুধু শিল্পগুণে শেষ কথা। 'বেশির ভাগ দর্শকই ··· বিষয়বস্তুকে একটা কথা অথবা গল্প হিসেবে দেখতে চান। অর্থাৎ ছবি অথবা মূর্তি কি বলছে। সত্যিকারের শিল্পীরা বলবে — আমার গল্প আমার ছবির রঙ, রেখা ও ফর্ম-এ, অথবা মাটি, পাথর, কাঠের গঠনে, মাস-ভল্যুম-ব্যালেন্স এবং ছন্দে। এতেই তো রয়েছে ছবি অথবা মূর্তির গল্প (পৃ. ৪৬)।' শিল্পবোধের আধুনিকতার দিক থেকে এই কথাটা খুব মূল্যবান ;

৫. স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে এ'রা মননের ; বিশ্লেষণী বুদ্ধির রাশ টেনে শিল্পকাজকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার স্তরে। আধুনিক শিল্প তাই মাতিয়ে তোলে না, মনন-নিয়ন্ত্রিত উপলব্ধি সক্রিয় করে।

১৯৬৫-এ প্রকাশিত *My Sculpture* সংকলনের ভূমিকায় প্রদোষ দাশগুপ্ত আমাদের শিল্পজাগরণকে একপেশে বলে আক্ষেপ করেছিলেন। বলেছিলেন, মুঘল-রাজপুত-কাংড়া কলমের চিত্রকলার দিকে আমাদের শিল্পীদের নজর গেল কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য বা উড়িষ্যার পাথরের কাজ বা বাংলার টেরাকোটার দিকে কারও নজর গেল না। স্থাপত্যে এবং স্থাপত্যের আশ্রয়ের ভাস্কর্যেই ভারতীয় প্রতিভার অভিব্যক্তি তুঙ্গে উঠেছিল। অথচ, আশ্চর্য — আধুনিক সচেতনতা সঞ্চারের পর্যায়ে স্থাপত্য-ভাস্কর্যই রয়ে গেল উপেক্ষিত। প্রদোষবাবু ঠিকই বলেছিলেন, আমাদের মূর্তিকলা ছিল স্থাপত্যের অঙ্গ। ইংরেজ আমলে স্থাপত্যের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল, তার সঙ্গে মূর্তিকলার আর কোনো যোগ রইল না (p. 10)। রাজপুরুষদের মূর্তিতে বড়ো বড়ো শহর ছেয়ে দেওয়া হল। বড়োমানুষদের বাগানবাড়ি সাজানোর জন্য ইতালির বিখ্যাত সব ভাস্কর্যের প্রতিরূপে ঢালাও আমদানি চলল। এইভাবে আমাদের ভাস্কর্যের সম্পন্ন ঐতিহ্যের সঙ্গে একালের শিল্পরুচির বিচ্ছেদের চূড়ান্ত হল।

আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যে বিলম্বিত সূচনা রামকিঙ্কর বেজ-এর (১৯০৬-৮০) হাতে। তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর (১৮৯৯-১৯৭৫) কথা মনে রেখেও রামকিঙ্করকেই প্রথম আধুনিক ভারতীয় ভাস্করের সম্মান দিতে হয়। শান্তিনিকেতন কলাভবনে মূর্তি গড়তে শেখানোর কোনোই ভালো ব্যবস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মিসেস মিলার্ড বা লিজা ফন্ পট — এ'রা কলাভবনে ছিলেন। কিন্তু সে খুবই অল্প দিন। আর এ'রা কেউই তেমন কিছু কৃতী শিল্পী ছিলেন না। প্রদোষবাবু লন্ডনে মিসেস

মিলার্ডের কাজের সংগ্রহ দেখেছিলেন বলেছেন। সে-সব কাজ তাঁর খুবই মামুলি মনে হয়েছিল। তবুও রামকিঙ্কর ইউরোপীয় ধরনে কাজের আভাস এঁদের কাছে পেয়েছিলেন বলা চলে। আভাস-মাত্র, ঠিক ঠিক শিক্ষা নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য শৌর্যময় প্রতিভার দীপ্তি ক্রমেই উজ্জ্বলতর হল এই গেঁয়ো মানুষটির মধ্যে। অ্যাকাডেমিক কোনো শিক্ষা ছাড়াই তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে দিয়ে গেলেন। প্রদোষবাবুর কথা যথার্থ, "পশ্চিমের দৈহিক অ্যাকাডেমিক রীতির সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক প্রেরণা-উদ্ভূত শৈলীর কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টাও রামকিঙ্কর কখনও করেন নি। ভারতীয় ভাস্কর্যের ফর্মের ছন্দোময় নমনীয়তা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলনাকার, অণ্ডাকৃতি অথবা গোলাকৃতি ডৌলের অভাব বিশেষ করে আমরা লক্ষ করি রামকিঙ্করের ভাস্কর্যে" (পৃ. ১২৮)। বিমূর্ত কাজের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া তাঁর অন্য বিখ্যাত সৃষ্টিগুলি কোনো ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ ভাস্করের কাজের গোত্রগত করে ভাবাও যায়না। ভাস্কর্যে ভারতীয় ধারা বলতে যা বোঝায় তার থেকে দূরে রইলেন, কিন্তু তাঁর কাজে স্থানীয় জীবনের ছাঁদ কী আয়াসহীন আকার পেয়েছে! বাঁকুড়া-বীরভূমের মানুষজনের, আকাশ এবং মাটির সংস্পর্শ ছাড়া তিনি কাজ করার মেজাজ পেতেন না। দেশীয়তা, এমন-কী আঞ্চলিকতায় ডুবে থেকেও রামকিঙ্কর আধুনিক বিশ্বের সেরা ভাস্করদের কাজের মান আয়ত্তে রেখেছিলেন। প্রদোষবাবু রামকিঙ্করের কাজের কিছু কিছু ত্রুটি দেখিয়েছেন। এও বলেছেন, প্রতিকৃতি রচনায় রামকিঙ্কর জ্যাকব এপস্টাইনের কাজ থেকে ইঙ্গিত নিয়েছেন। এসব একান্তই খুচরো সমালোচনা ছাপিয়ে ওঠে রামকিঙ্করের কাজের জোর। দূরে থেকে হলেও রামকিঙ্কর ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন — এটা এই শিল্পীসংঘের গৌরব করে বলার মতো কথা।

রামকিঙ্কর ছাড়া গ্রুপের আর দুজন ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী কমলা দাশগুপ্ত। "আমার এবং কমলার ভাস্কর্য" পরিচ্ছেদে দুজনেরই কাজের ফলাও বিবরণ আছে। নিজের কাজের বিকাশ এবং বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে *My Sculpture* বইয়ের ভূমিকার বস্তুও অনেকটা এখানে ফিরে পরিবেশন করেছেন। সঙ্গে আছে নিজের শিক্ষাদীক্ষার পরিবেশ, ভাস্কর্যে আদর্শের সন্ধান আর তত্ত্বগত অবস্থান স্থির করার সহজাত ক্ষমতার বিবৃতি। ১৯৩২-৩৪, দু-বছর প্রদোষবাবু লখনৌ- হিরন্ময় রায়চৌধুরীর এবং ১৯৩৪-৩৭ মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর ছাত্র ছিলেন। লখনৌ-এ ভাস্কর্যের থেকে গানের দিকেই প্রদোষবাবুর ঝোঁক ছিল বেশি। "তাই ওখানে ভাস্কর্য কলার বিশেষ কিছু শিখি নি"। (পৃ. ১৭)। আর "সত্যিকারের ভাস্কর্যের প্রাথমিক শিক্ষা" দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে হলেও প্রদোষবাবুর মতে দেবীপ্রসাদ নিজে খুব ভালো শিক্ষক ছিলেন না। ওঁর পালোয়ানের মতো চেহারা আর তার সঙ্গে ওঁর কাজ করার পদ্ধতি অবাক

হয়ে দেখার মতো। আর এই দেখাটাই আমার পক্ষে মস্ত একটা শিক্ষা ছিল"। (পৃ. ২১)। ১৯৩৭-এ প্রদোষবাবু লণ্ডনের রয়াল অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন এবং শিক্ষা শেষ করে দেশে ফেরেন ১৯৪০-এ। ছাত্রবয়সে জ্যাকব এপস্টাইনের (১৮৮০-১৯৫৯) কাজ তাঁকে খুব টানত। এক এপস্টাইনের কাছেই লেখক খানিকটা ঋণ স্বীকার করেছেন। (পৃ. ২১)। কিন্তু প্রবীণ প্রদোষ দাশগুপ্ত মশায়ের আত্মসমীক্ষার প্রধান উপলব্ধি হল,

"আমার ভাস্কর্যসৃষ্টির একটা ক্রমবিকাশের ধারা গড়ে উঠেছে আপনা থেকেই। এটা আমার মনে হয় আমার চরিত্রগত। ... আমার পক্ষে, আমার এগিয়ে যাবার পথে ধাপগুলো যেন আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, আমাকে শুধু পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে আমার শিল্পী জীবনের প্রথম থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারায় একটা নিজস্ব অভিমত ছিল যা আমি বিশেষভাবে অনুসরণ করেছি আমার জীবনে। আমার এই মতামত ভারতীয় ঐতিহ্যের ছায়ায় পুষ্ট এবং আধুনিক বিশ্বচেতনায় সমৃদ্ধ।" (পৃ. ৬২)।

নিজেকে বার বার বিজ্ঞান-মনস্ক বলা সত্ত্বেও এ বক্তব্যে প্রদোষ দাশগুপ্ত যেন নিজের শিল্প-বিকাশের প্রক্রিয়াকে কেমন এক দৈববিধানের অধীন মনে করেছেন। কোনো শিল্পীর জীবনে এমন ঘটতে দেখা যায়নি। প্রদোষবাবুর প্রাথমিক অ্যাকাডেমিক কাজের স্তর থেকে নতুন পর্যায়ে উত্তরণে — যার মূলে দুর্ভিক্ষ-মহামারীর অভিঘাত ছিল — গড়নের আর এক ভাষা আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সমকালীন দর্শকেরা সেই ভাষায় নিজেদের যন্ত্রণার রূপ দেখতে পেয়েছিলেন। চারুতা, চুনকো কারুকাজ, পেলব অলংকরণের দিকে তিনি যাননি। মান-পরিমাণের গাণিতিক বাঁধন মানার দায়ও অমান্য করলেন। পরাধীনতার দুঃসহ চাপ ভারতীয় মনে ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা এবং বিদ্রোহ জাগাত — প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্যে তার প্রবল অভিব্যক্তি এল অবয়বের বিস্ফারে, রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গির প্রচণ্ডতায়। ১৯৪০-এ 'ইন বণ্ডেজ' নামে ব্রোঞ্জের কাজটি মনে আসে। এই কাজ বা সমকালীন তাঁর অন্য কাজে ঐতিহ্যসম্মত ভারতীয়ত্বই বা কোথায়? ভারতবর্ষের আর-এক ইতিহাসের বাস্তবতা রূপ দিতে খুব সংগত ভাবেই প্রদোষ-বাবু নতুন ভাষা উদ্ভাবন করেছিলেন। লক্ষ করবার বিষয়, তখনকার কাজেও অভিব্যক্তির সরলতার দিকে ঝোঁক ছিল। এই ঝোঁক পরের পর্যায়ে আরও তীব্র হয়েছে। সেখানেও সচেতন পরীক্ষার ব্যাপার আছে, কিছুই আয়াসহীন নয়।

প্রদোষবাবু বলেছেন, "আমার কাজে পৃথুলতার আবেগ থাকলেও তার বিকাশ নেই, বর্তুলতার মেজাজে ভরপুর"। (পৃ. ১৫৪)। তাঁর সব চেয়ে বেশি পরিচিত স্টাইল অত্যন্ত ভারি গড়ন — বিশেষত মূর্তির নিচের দিকে।

গোলাকার ডৌল এবং স্থূলত্ব এই গড়নের বৈশিষ্ট্য। প্রদোষবাবুর মতে এই গড়নে ভেতরের প্রাণবায়ুর প্রবল বাহির-মুখী চাপ অনুভব করা যায়। প্রাণবায়ু বাহিরে বয়ে যাচ্ছেনা, টেন্‌শন ভেতরে অবরুদ্ধ রয়ে যাচ্ছে। তাতে ভাস্কর্যটি যেখানে রাখা থাকছে সেই জায়গার বা স্পেসের সঙ্গে কোনো সংঘাত ঘটছে না। তিনি মনে করেন প্রাণবায়ুকে এইভাবে ধরে রাখার তত্ত্ব ভারতীয় ভাস্কর্যের মূল ভিত্তি। মার্কিন ভাস্কর রিচার্ড হান্টকে বোঝাতে গিয়ে এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "আপনি যদি এমন কোনো ভাস্কর্য গড়েন যার সমস্ত প্রাণবায়ু চারি দিকে বিক্ষিপ্ত তাহলে তার নিজস্ব কোনো গম্ভীর মেজাজ থাকেনা, খুবই হালকা লাগবে দেখতে। আমরা ভারতীয়রা, এই প্রাণবায়ুকে ধরে রাখার দার্শনিক যুক্তি পেয়েছি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ থেকে"। (পৃ. ৬৮)। The concept is that the entire universe is like an egg. The shape, the form is spherical and in the egg, within itself, is a spirit, the energy which never dies' ('Richard Hunt and Prodosh Dasgupta : a conversation', *Lalit Kala Contemperary* — 26, Sept. 1978, p. 28)। প্রশ্ন হল, ভারতে বহু শতাব্দী ধরে যত কাজ ভাস্কর্যে হয়েছে তার সর্বত্রই কি এই তত্ত্বের সমর্থন মেলে? প্রাণবায়ু ধরে রাখার তত্ত্ব না জানায় কি ইউরোপীয় ঐতিহ্যের এবং ভাস্কর্য মেজাজে হালকা? প্রদোষবাবুর নিজের সব স্তরের কাজেও এ তত্ত্বের প্রয়োগ চলেনা। 'প্রাউড মাদার' (১৯৫২) বা তাঁর নিজেরই খুব প্রিয় সৃষ্টি 'ক্যাক্টাস ফ্যামিলি'কে (১৯৫৩) এই তত্ত্বের আওতায় কী করে আনবেন?

আর এক ধাপ এগিয়ে প্রদোষবাবু মন্তব্য করেন, "আমাদের গ্রুপ মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী, যদিও আমরা উদার ভাবাপন্ন ছিলাম . । আমরা সব সময়েই আমাদের ভারতীয় ষড়ঙ্গের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করেছি, বিশেষত "সাদৃশ্যমান" বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে"। (পৃ. ৬০)। ষড়ঙ্গ মেনে কাজ করার অর্থ কী সত্যি সত্যি? 'রূপভেদ', 'প্রমাণ', 'ভাব', 'লাবণ্য-যোজনা', 'সাদৃশ্য', 'বর্ণিকাভঙ্গ' — শিল্পের এই ছয় অঙ্গের ব্যাখ্যানের কাঠামোয় তো পৃথিবীর তাবৎ শিল্পকে পুরে দেওয়া যায়। "সাদৃশ্যমান বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক" রাখা ব্যাপারটিও খুব স্পষ্ট নয়। সতীর্থ শিল্পীদের কাজ ধরে ধরে যেখানে লেখক কথা বলেছেন, বইটির সে-সব অংশ পড়ে ভালো লাগে। শিল্পদৃষ্টির আলোও পাওয়া যায় অনেকটা। গোবর্ধন আশ, অবনী সেন বা হেমন্ত মিশ্র নামই ইদানীং ওঠেনা সচরাচর। প্রদোষবাবু যত্ন করে এ'দের পরিচয় দিয়েছেন। একেবারে চুপচাপ মানুষ প্রাণকৃষ্ণ পাল নিজের স্বভাবে আধুনিক ছবির ভাষা নিয়ে কত তাৎপর্যময় পরীক্ষা করেছেন এক সময়ে। ইন্ডিয়ান সোসাইটির ছকে বাঁধা চর্চার আওতা থেকে তিনিও বেরিয়ে এসেছিলেন সাক্ষাৎ মর্মান্তিক বস্তুবতার

ধারায়। অচঞ্চল, অনুচ্ছল স্বভাবে সেই অভিজ্ঞতার প্রতীক রচনা করেছিলেন। "মা ও ছেলে", "পরিবার" — এসব ছবিতে বিষয়গত তীব্রতা নিরাবেগ, সরল, অথচ মর্মে গেঁথে যাবার মতো আঙ্গিকে রূপ দেবার অসামান্য কৃতিত্বের কথা প্রদোষবাবু যত্ন করে লিখেছেন। তেমনি যত্ন করে পরিতোষ সেনের ছবির বিবর্তনের কথা, সুনীলমাধব সেনের কথা বলেছেন। ক্যালকাটা গ্রুপ নিয়ে দলাদলির প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তেতো হলেও গোপাল ঘোষ বা নীরদ মজুমদারের, সুভো ঠাকুর বা রথীন মৈত্রর ছবি সম্পর্কে প্রদোষবাবুর অবলোকন এঁদের কাজের তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করবে। খুবই প্রশংসা পেয়েছেন এঁদের মধ্যে বয়সে সবার ছোটো রথীন মিত্র।

মাঝে-মধ্যে অবশ্য উল্টোপাল্টা মন্তব্যে পাঠককে হোঁচট খেতে হয়। যেমন ১৩৫ পৃষ্ঠার উক্তি যে, যামিনী রায় লৌকিক পটচিত্রের ছায়া থেকে বেশি দূরে যেতে সাহস করেন নি অথবা ইচ্ছে করেই যাননি। তুলনায় সুনীলমাধব তাঁর বুদ্ধিপ্রসূত অনুসন্ধানে পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের বাংলার লোকচিত্রের একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রদোষবাবুর তুলনামূলক এই বিশ্লেষণ কিন্তু ৮৯ পৃষ্ঠার মন্তব্যের সঙ্গে মেলেনা। সেখানে তিনি যামিনী রায়ের অঙ্কন-রীতি ও ছবির মেজাজের বিবর্তন-বিকাশ দেখিয়েছেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের ছবিতে বাইজেনটাইন রীতির সবল রেখার সঙ্গে আমাদের দেশজ পটের রীতির মিলনে সৃষ্টি অপরূপ রূপের তারিফ করেছেন।

আর, এরকম একটা বইয়ের মধ্যে তাঁর প্রয়াত দুই বন্ধু নীরদ মজুমদারকে আবোল তাবোল বকা পাগল এবং গোপাল ঘোষকে অপরিণামদর্শী আত্মঘাতী মাতাল বলা রুচিকর লাগেনা। প্রদোষবাবুর বিবেচনায় রথীন মৈত্র এবং গোপাল ঘোষ আর্ট কলেজের অধ্যাপক পদ নেওয়ায় আদর্শভ্রষ্ট। তিনি নিজেও তো অধ্যাপক পদে এবং ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট-এ ডিরেক্টর পদে চাকরি করেছেন জানি।

বইটি শেষ করে বিস্ময় লাগে — এত রকম কোন্দল সত্ত্বেও ক্যালকাটা গ্রুপ দশ বছর টিঁকে ছিল কী করে!

পূর্ণেন্দু পত্রীর লে-আউট চমৎকার। সাদাকালোয় হলেও প্রত্যেক শিল্পীর কাজের অনেক নমুনা দেওয়ায় পাঠ্য অংশ বুঝতে সুবিধে হয়। কিন্তু উৎসর্গপত্র থেকেই ছাপার ভুলের শুরু — ভেতরে তো অগুন্তি ভুল। এমন-কি একই নামের বিভিন্ন বানান রয়েছে।